কুরআনের আলোকে

# কুরআন ইতিহাস হাদিস

সৈয়দ ওয়ালিউল আলম

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের আলোকে

# কুরআন ইতিহাস হাদিস

বিশ্বব্যাপী বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে 'ইসলাম' যখন আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দু তখন কিছু প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে। 'কুরআনের আলোকে কুরআন, ইতিহাস ও হাদিস' গ্রন্থে লেখক এই প্রশ্নের যেমন প্রাথমিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন একই সঙ্গে তিনি এ সংক্রান্ত একটি একাডেমিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর চেষ্টা করা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

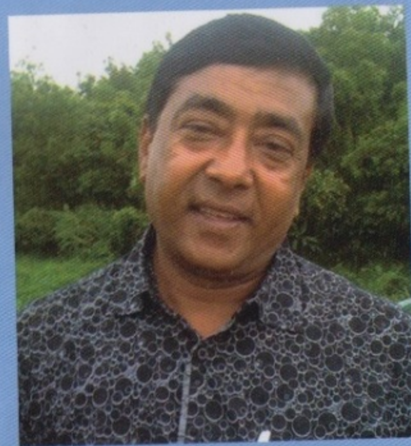

ওয়ালিউল আলম। সাংবাদিক ও লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স শেষ করে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। প্রায় ২২ বছর ধরে তিনি সাংবাদিকতা করছেন। বাংলাদেশে তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

# কুরআনের আলোকে

# কুরআন ইতিহাস হাদিস

সৈয়দ ওয়ালিউল আলম

তরফদার
প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের আলোকে কুরআন, ইতিহাস হাদিস

সম্পাদনা : নাসিরা আফরোজ রোজী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রকাশক : মাহবুব আলম, তরফদার প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৫-৪৫৬৩২৮, ০১৬৭৩-৫৮৫৪৯২

স্বত্ব : সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
৯০-৭২ ১০৮ স্ট্রিট, হলিস, নিউইয়র্ক, এন ওয়াই-১১৪২৩
*[এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ বা পূর্ণ অংশ 'অবিকৃতভাবে'
পূনঃমূদ্রণে কোন পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই]*

প্রচ্ছদ : সুজন জাহাঙ্গীর

বর্ণবিন্যাস : মো. বেলাল হোসেন খাঁন

মুদ্রণ : ইউএন প্রেস
৪/১ ওয়াল্টার রোড, ঢাকা-১১০০

অন-লাইন পরিবেশক
rokomari.com/tarafdar
ফোন : ০১৫১৯-৫২১৯৭১

ভারতে পরিবেশক
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

**মূল্য : ২৫০.০০**

Quraaner Aloke Quraan, Etihas Hadish
Published by Tarafdar Prokashoni
2/3 Paridas Road, Dhaka-1100
Bangladesh, Phone : 01715-456328
Date of Publication : February 2018

**Price : Tk. 250.00 US 30 $**

ISBN 978-984-93323-3-6

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

যাদের সাথে তাদের জীবদ্দশায় ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্ক ছিল আমার জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা
আমার পিতা **'মরহুম সৈয়দ আলী হাসান'** ও পুত্র **'মরহুম সৈয়দ রিজওয়ানউল হাসান'** স্মরণে-

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যাদের সাথে ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক এই গ্রন্থটি লেখার বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছে:
সৈয়দ শামসুল আলম
সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম
নাসিরা আফরোজ রোজী
কামরুল ইসলাম খান
সৈয়দা পাপিয়া আলম
সৈয়দা নাসিরা আলম
মোহাম্মদ সাঈদ
কাউসার মুমিন
ইমরান আনসারী
তোফাজ্জল লিটন
জীবন শফিক
ড. জাহানারা রিও, এমডি
সৈয়দা হাস্নান নাহার
সৈয়দা সাইদুন নাহার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১.১ | ভূমিকা | ৭ |
| ২.১ | কুরআন | ১৭ |
| ২.২ | ভাষা | ৩২ |
| ২.৩ | অনুবাদ | ৪০ |
| ২.৪ | বুঝে পাঠ করা, অর্থগ্রহণ | ৫৩ |
| ২.৫ | লজিক, বিতর্ক, বিদ্রূপ | ৭৩ |
| ৩.১ | ইতিহাস | ৮৮ |
| ৩.২ | সংস্কৃতি, ঐতিহ্য | ১১২ |
| ৩.৩ | সাক্ষী ও সাক্ষ্য | ১২৯ |
| ৪.১ | হাদিস | ১৩৬ |
| ৪.২ | হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা | ১৪৮ |
| ৪.৩ | হাদিসবেত্তাগণের যুক্তি, রাসুল (সঃ)এর অনুসরণ | ১৫৩ |
| ৪.৪ | হাদিসে বিশ্বাস, উপসংহার | ১৭০ |


www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# ১.১ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব সংকটের প্রেক্ষিতে ইসলাম এখন বিশ্বব্যপী আলোচনার প্রধান বিষয়। এ আলোচনা যেমন একাডেমিক পর্যায়ে হচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রপরিচালক ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারক থেকে শুরু করে ব্যক্তিপর্যায়ে - সাধারণ মানুষের আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা, ব্যক্তিগত ড্রইং রুমে বা চায়ের টেবিলের খোশগল্প- সর্বত্রই দৃশ্যমান। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত এমন কিছু ঘটছে যার প্রভাব কোন সচেতন, বিবেক ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তিই চোখ বন্ধ করে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। যারা নিজেদের 'মুসলিম হিসেবে দাবি করেন', 'ট্রাডিশনাল মুসলিম', 'প্রকৃতই বিশ্বাসী' অথবা অর্ধবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী -সকলের জন্যই এ পরিস্থিতি নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অন্য দিকে বিশ্বব্যপী মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

ইসলাম সম্পর্কে একাডেমিক আলোচনায় 'ইসলাম' এবং 'মুসলিম' -এ দুটি ধারণা সংজ্ঞায়িত করা কাঠামোর ব্যাপ্তি নির্ধারণের লক্ষ্যে একাডেমিশিয়ান ও স্কলাররা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করছেন। সেই সাথে বহু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধও লেখা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ পর্যায়ে তো বটেই এমনকি একাডেমিক ও স্কলার পর্যায়ের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বা আলোচনা পর্বে অথবা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও নোটে ইসলামের স্বরূপ সন্ধান বা ইসলাম সম্পর্কে কোন নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে যেসব নথি, তথ্য, উপাত্ত, উদাহরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যে পদ্ধতিতে করা হচ্ছে- সে সম্পর্কে সম্ভবত ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনার ফলাফল দাঁড়াচ্ছে শূন্য। বহু ক্ষেত্রে সেগুলো ইসলাম সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করছে। এই 'বিভ্রান্তি' যেমন একাডেমিশিয়ান ও স্কলারদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য আরো তীব্র করছে আবার রাষ্ট্রপরিচালক, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও ঘৃণা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সংকট আরো ঘণীভূত হচ্ছে।



www.nagorikpathagar.org

যে কোন একাডেমিক আলোচনায় যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী নিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা বা কাঠামো সংজ্ঞায়িত করার কাজটি জরুরি। কোন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত সে বিষয়ে আলোচনায় কোন সুদৃঢ় কার্যকরী সিদ্ধান্তে পৌঁছান অসম্ভব। সে আলোচনা শুধু বিভ্রান্তি ও মতভেদকেই উসকে দিতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন একাডেমিক আলোচনায় বিষয়বস্তু যদি হয় 'ইসলাম ও গণতন্ত্র' তাহলে সে আলোচনায় আলোচকদের মধ্যে 'ইসলাম কি' ও এর কাঠামোর বিস্তৃতি সম্পর্কে যেমন যৌক্তিক সাধারণ ঐকমত্য বা ধারণা থাকতে হবে, সেই সাথে গণতন্ত্র সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্র সম্পর্কে যেমন বিশ্বব্যপী একটি স্পষ্ট কাঠামো বা ধারণা আছে এবং স্পষ্ট কাঠামো বা ধারণা সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্য আছে কিন্তু ইসলাম ও ইসলামের কাঠামো সম্পর্কে কি এমন কোন সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছান গিয়েছে?

যদি আদৌ সেটি সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে 'গণতন্ত্র ও ইসলাম' সংক্রান্ত আলোচনায় আদৌ কি কোন যৌক্তিকতা আছে। শতবছর ধরে আলোচনা চলতে থাকবে, কিন্তু বাস্তবে কোন কার্যকরী সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হবে না।

ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা, ধারণা বা আদর্শ -যে শব্দেই বিষয়টিকে অভিহিত করা হোক না কেন, সাধারণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এসব নিয়ে যেমন 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার' বা মুসলিম হিসেবে তথাকথিতভাবে চিহ্নিত বিশ্বের ১৬০ বিলিয়ন জনগোষ্ঠী নিজেরাই বহুধাভাগে বিভক্ত ও তীব্র মতপার্থক্যে জর্জরিত তেমনি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বড় অংশ, ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের মধ্যে এতটাই তীব্র মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছেন যে, একটি পক্ষ অপর পক্ষকে হত্যা করে নির্মূল করতেও দ্বিধা করেন না! আবার বিশ্বের বাকি ৫৪০ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধারণা ও মত প্রকাশ করেন এবং এই জনগোষ্ঠীরও একটি অংশ ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে এতোটাই হিংস্র যে তারা মুসলিম হিসেবে তথাকথিতভাবে চিহ্নিত ১৬০ কোটি জনগোষ্ঠীকেই হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর! বিপরীতক্রমে


www.nagorikpathagar.org

মুসলিম হিসেবে দাবিদার এই ১৬০ বিলিয়নের মধ্যেও এমন একটি বড় অংশ আছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের দৃষ্টিতে বিধর্মী-কাফির ৫৪০ বিলিয়ন মানুষকেই রক্তপাতের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন! ফলে দিন যতই গড়াচ্ছে, মানুষে মানুষে হানাহানি, পারস্পারিক বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা যেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। যার প্রভাবে বিশ্ব সভ্যতার সামগ্রিক মূল্যবোধই আজ চরম সংকটাপন্ন।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের 'কাঠামো বা সংজ্ঞা এবং রূপরেখা' সম্পর্কে বিশ্বের একাডেমিশিয়ান, স্কলার এবং সম্ভবত সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটি প্রাথমিক ঐকমত্য গঠিত হয়েছে। অবশ্য দেশে দেশে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের অপব্যবহারও যে হচ্ছে না- তাও নয়। কিন্তু যেহেতু গণতন্ত্রের কাঠামো, সংজ্ঞা ও উপাদান সম্পর্কে সার্বজনীন মানদণ্ড নিয়ে সাধারণ ঐকমত্য আছে, ফলে এই যে কেউ গণতন্ত্রের অপব্যবহার করলে -সে বিষয়টি চিহ্নিতকরণের কাজটি সহজ হয়। যে কারণে এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্তত নীতিগতভাবে হলেও ঐকমত্য সৃষ্টি কঠিন কিছু নয়। এই ক্ষেত্রে একাডিমিশিয়ান ও স্কলাররা খুব সহজভাবেই কোথায়, কে কিভাবে গণতন্ত্রের বিচ্যূতি করছে তা চিহ্নিত করতে পারছেন এবং সে বিচ্যুতিগুলো  সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন। একাডেমিশিয়ান ও স্কলার পর্যায়ে এ বিষয়ে ভিন্নমতের পোষণের সুযোগ খুবই কম।

গণতন্ত্র মানুষের উদ্ভাবিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাপ্রসূত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সাধারণ 'ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা' করা একটি কঠিন কাজ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিজস্ব চিন্তায় ও তত্ত্বে এই গণতন্ত্র সম্পর্কে মতপার্থক্য কম ছিল না। কিন্তু বিশ্বব্যপী সার্বজনীন মূল্যবোধে ভালো-মন্দের ধারণা প্রসূত চিন্তার ঐক্য থেকে এই কঠিন কাজটি বাস্তবেই সম্ভব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলাটা অযৌক্তিক হবে না যে, গণতন্ত্রের কাঠামো বা সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রাথমিক ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেয়ে সম্ভবত 'ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা ও আদর্শ' সম্পর্কে বিশ্বব্যপী মানুষের 'জ্ঞান বা ধারণা'য় একটি স্পষ্ট


www.nagorikpathagar.org

সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি আরো সহজ হওয়ার কথা ছিল। অন্তত সাধারণ পর্যায়ে না হোক, বিশ্বের একাডিমিশিয়ান ও স্কলারদের মধ্যে 'ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা ও আদর্শ' অথবা এর 'প্রকৃত স্বরূপ'টি কি সে সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্য সৃষ্টি সহজেই হতে পারত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সে কাজটি যে আদৌ সম্ভব হয়নি– এ বিষয়ে সম্ভবত কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না।

বিশ্বব্যাপী তো দূরান্ত, এমনকি 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার' বিশ্বের ১৬০ বিলিয়ন মানুষের মধ্যেই কি 'ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা ও আদর্শ' সম্পর্কিত ধারণা অথবা এর 'প্রকৃত স্বরূপ'টি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ঐকমত্যে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে?

এ ক্ষেত্রে একবারেই যে কোন ঐকমত্য নেই, তা অবশ্য বলা যায় না। একটি বিষয়ে 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার', 'ট্রাডিশনাল মুসলিম' 'প্রকৃত বিশ্বাসী ' অথবা অর্ধবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী -সকলেই একমত যে : 'কুরআন' এবং 'মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবনী ও কর্মকাণ্ড'ই হলো ইসলামের কাঠামো। 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার' এবং 'ট্রাডিশনাল মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, পবিত্র কুরআন 'ঐশরিক বাণীর সংকলন।' এই শাশ্বত বাণী রাসুল (সঃ) ঐশরিকভাবে প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি তা পবিত্র কুরআনে হুবহু সংকলিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ বিধি বিধান অনুসারেই তিনি নিজ জীবন-যাপন ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছেন। স্বভাবতই তাদের কাছে ইসলাম চর্চ্চার ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ। 'অবিশ্বাসী' এবং 'অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের একটি অংশ' মনে করেন, কুরআন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর রচনা এবং স্বভাবিকভাবেই, এই গ্রন্থে মুহাম্মাদ (সঃ) তার নিজ্স্ব চিন্তা, চেতনা ও দর্শন ও নিজ জীবনের কিছু কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেছেন।

উভয়পক্ষের অবস্থানে পরস্পর বিরোধী উপাদান থাকলেও উভয়ের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্যও আছে : 'কুরআন' এবং 'মুহাম্মাদ (সঃ)-এর চিন্তা, চেতনা ও দর্শন ও কর্মকাণ্ড'- পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট থেকে একমাত্র কুরআন ছাড়া যেহেতু আর কোন গ্রন্থ মানব জাতির নিকট পৌঁছান হয়নি সুতরাং আরেকটি সিদ্ধান্তেও


www.nagorikpathagar.org

পৌঁছানো অযৌক্তিক হবে না যে, ঐশরিক শক্তির আদেশে হোক বা মুহাম্মাদ (সঃ) নিজের আকাঙ্ক্ষা থেকেই হোক, তিনি তার এই একটি গ্রন্থে যে 'আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ বিধি-বিধান ও এই গ্রন্থে বর্ণিত চিন্তা, চেতনা, দর্শন এবং এখানে তার নিজ জীবনের যেসব কর্মকাণ্ড' বিবৃত হয়েছে সেগুলোকে তিনি তার নিজ জ্ঞানে তার অনুসারী এবং সর্বপরি মানবজাতির জন্য তার মূল 'আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ বিধি-বিধান ও চিন্তা, চেতনা, দর্শন' এবং 'তার জীবনের মূল কর্মকাণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুতারাং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান অযৌক্তিক হবে না, এই একটি বিষয়ে 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার', 'ট্রাডিশনাল মুসলিম' 'প্রকৃত বিশ্বাসী' অথবা অর্ধবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআন ইসলামের মূল গ্রন্থ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কুরআন যদি বাস্তবেই ইসলামের মূল গ্রন্থ হয়, তবে 'ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা, ধারণা ও আদর্শ' অথবা 'প্রকৃত স্বরূপ'টি সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছান কি গণতন্ত্র সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছানোর থেকে সহজ ছিল না?

এ প্রশ্নটি থেকেই শুরু হবে বিতর্ক। 'মুসলিম হিসেবে দাবিদার' স্কলারদের অধিকাংশই এ প্রশ্নে বলেন, পবিত্র কুরআনে 'ইসলামের কাঠামো, সংজ্ঞা, ধারণা ও আদর্শ, স্বরূপ' অথবা এর চর্চার দিকটি সম্পর্কে 'বিস্তারিত' বলা হয়নি। এবং এ উত্তরটি দেওয়ার সাথে সাথে তারা 'ইসলাম' সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত নানা তত্ত্ব ও ইসলাম ও কুরআনের আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সেই সাথে নানা তথ্য, নথি, উপাত্ত, উদারহণ, সংস্কার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস হাজির করবেন। রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর গত ১৪'শ বছরের মানুষ উদ্ভাবিত এসব তত্ত্ব, ব্যাখ্যা, তথ্য, নথি, উপাত্ত, উদারহণ, সংস্কার, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পরিমাণ এত বিশাল এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে এত বৈপরীত্য যে মানুষের জ্ঞানে এগুলোর মধ্যে কোন ঐক্যের সূত্র বের করা অসম্ভব।

পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম নয়, এ অভিযোগ যেমন অবিশ্বাসী ও অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী একাংশের তেমনি বিশ্বাসীদের একটি বৃহৎ অংশও যখন বলেন, কুরআনে বিস্তারিত বলা হয় নি– সেটিও তাদের অজ্ঞাতে


www.nagorikpathagar.org

হলেও, 'কুরআন পর্ণাঙ্গ নয়' বলে কুরআনের বিরুদ্ধে তারা একটি অভিযোগই দাঁড় করছেন।

সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। সুন্নাতে রাসুল (সঃ) হলো : রাসুল (সঃ) এর চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যখন কুরআনের পরিবর্তে রাসুল (সঃ)-এর সমকালীন কয়েকজন অনুসারীর মৌখিক বর্ণনায় প্রাপ্ত রাসুল (সঃ) এর চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি ইসলামের অপরিহার্য অংশ বলে দাবি করা হয়, তখন এই দাবিদারাও তাদের অজ্ঞাতে হলেও কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যে, এই গ্রন্থে রাসুল (সঃ) অনুসৃত তার জীবনের 'চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি' স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি বা হলেও তা খণ্ডিত আকারে করা হয়েছে।

'ইসলামের কাঠামো, স্বরূপ, আদর্শ, দর্শন' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কি আদৌ স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি? কুরআন কি ইসলাম চর্চ্চার জন্য 'বিস্তারিত' ও পূর্ণাঙ্গ নয় ? কুরআন তার নিজের সম্পর্কে কি বলছে ? হাদিসে রাসুল, ইতিহাস, ঐতিহ্য- এসব প্রসঙ্গেই বা কুরআন কি বলছে? অবিশ্বাসী ও অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীদের একাংশ কুরআন ও রাসুল সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন তুলছে, সেসব প্রশ্নেই বা কুরআনের অবস্থান কি?

কুরআন দাবী করছে:

"-----------। *ইহা এমন বাণী, যাহা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার প্রত্যায়ন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।" (১২:১১১)*

*"আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।" (১৮:৫৪)*

*"(বল), 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমান (কুরআন) অবশ্যয় আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে; আর কেহ না দেখিলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নই'।" (৬:১০৪)*

*"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।' তাহাদের হাত*


www.nagorikpathagar.org

*যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তহাদের এবং যাহারা তাহা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাহাদের।" (২ঃ৭৯)*

সুতরাং তিনি বিশ্বাসীই হোন আর অবিশ্বাসীই হোন, যে গ্রন্থ উপরোক্ত দাবী করছে সে গ্রন্থের কোন বিধি-বিধান, উপদেশ-নির্দেশ, দর্শন সম্পর্কে আলোচনায় বা উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের সত্যা-সত্য উত্তর নির্ধারণে এই গ্রন্থের বাইরে যাওয়ার অবকাশ আদৌ আছে কি?

মানুষের অর্জিত জ্ঞানে বলা হচ্ছে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐ সিদ্ধান্তের মান নির্ভর করে ঐ সংক্রান্ত তথ্যের মান এবং যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তার প্রাজ্ঞতার ওপর। একটি বিষয়ে যতবেশী তথ্য পাওয়া যাবে এবং প্রাপ্ত তথ্য যতো বিস্তারিত ও নির্ভূল হবে, সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যতোবেশী প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী সম্পন্ন হবেন সে সিদ্ধান্ত ততো বেশী নির্ভূল ও কার্যক্ষম হবে। মানুষের অভিজ্ঞতাই বলছে, এই তথ্য জড় করা এবং মানুষের জ্ঞানে তা বিশ্লেষন করে একশতভাগ সঠিত সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু কুরআন যে পরম সত্ত্বার দাবী করা হচ্ছে, তার বর্ণনায় বলা হচ্ছে, তিনি পরম প্রাজ্ঞ এবং যে কোন বিষয়ে তিনি পূর্ণ দ্রষ্টা ও শ্রবনকারী। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও প্রাজ্ঞময় সুতরাং তিনি যখন দাবী করেন যে কোন বিষয়ে জ্ঞানে তিনিই একমাত্র নির্ভূল সে দাবী মানুষের বাস্তব জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কুরআন দাবী করেঃ

*"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, তাহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (৬ঃ১১৫)*

যুক্তিসংগত প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন সত্যকে অনুমান, অর্ধসত্য বা অসত্য দিয়ে ব্যখ্যা করা হলে সে সত্যের সরূপটি কেমন দাঁড়াতে পারে বা জ্ঞানের জগতে তার গ্রহণযোগ্যতাই বা কতটুকু? এই পটভূমিতে কুরআনের কোন শব্দ, বাক্য, বিধি-বিধান, আদেশ-উপদেশ বা আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য কুরআন ব্যতীত আর কোন বিকল্প গ্রহণের অবকাশ আছে কি?

কোন বর্ণনা, উক্তি বা ঘটনার সত্যতা যাচাই-এ আধূনিক মানুষ তার জ্ঞানে বেশ কতগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কোন বিষয় বা ঘটনার সত্যতা


www.nagorikpathagar.org

যাচাইয়ে কুরআনেও বেশ কিছু পদ্ধতি গ্রহণে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষনীয়, বিষয় হচ্ছে যে, এই ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে মানুষের অর্জিত জ্ঞান এবং প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরআনে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের অর্জিত জ্ঞানেই হোক কিম্বা কুরআনের উপদেশের আলোকেই হোক- এই জ্ঞানের মানদন্ড অনুযায়ী যদি 'কুরআন ও ইসলাম' সম্পর্কে মানুষের বর্ণিত বা দাবীকৃত প্রচলিত ইতিহাস, হাদিস ইত্যাদি বিশ্লেষন করা ও যাচাই বাছাই করা হয়-তার সরূপটি বা গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে?

'ইসলামের কাঠামো, স্বরূপ, আদর্শ, দর্শন' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আদৌ স্পষ্ট বলা হয়নি অথবা বলা হয়েছ, হয়তো কুরআন বাস্তবেই 'বিস্তারিত' ও 'পূর্ণাঙ্গ' নয় এবং হাদিসে রাসুল, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রকৃতই ইসলামের বিধি-বিধান আদেশ উপদেশ পালনে অপরিহার্য অংশ অথবা এই যে দাবি করা হচ্ছে তার সবটুকই অসত্য- এ সকল কিছুরই উত্তর দিতে পারে একমাত্র কুরআন।

'মুসলিম হিসেবে দাবিদার', 'ট্রাডিশনাল মুসলিম' 'প্রকৃত বিশ্বাসী' অথবা অর্ধবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী তিনি যেই হোন না কেন তার কাছে, কুরআন ইসলাম চর্চা ও বিধি-বিধানের একমাত্র উৎস হোক, মূল গ্রন্থই হোক-অথবা সহযোগী গ্রন্থ, কুরআনে কোন বিষয় আছে-বা নেই, পূর্ণাঙ্গভাবেই আছে বা ভগ্নাংশ আছে– এসব প্রশ্নে যা বলা হচ্ছে তা হয়তো সঠিক- কিন্তু এই যে সঠিক সেটি যাচাই-বাছাই করার একমাত্র পথ হচ্ছে, কুরআন পাঠ।

রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর গত ১৪'শ বছরে ইসলামের নামে 'মানুষ্য বর্ণিত ও রচিত' বহু তত্ত্ব-তথ্য, ব্যাখ্যা, নথি, উপাত্ত, উদারহণ, সংস্কার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। তবে কে, কোন উদ্দেশ্যে-কি 'বর্ণনা' দিয়েছেন বা রচনা করেছেন তা তিনিই ভালো জানেন। হতে পারে বর্ণনাকারী বা রচয়িতা প্রকৃতই আল্লাহর পথকে আরো স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং এমনও হতে পারে ইসলামের নামে এসব 'বর্ণনা ও রচনা'-এর পেছনে কোন না কোন পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কাজটি করা হয়েছে। আবার হতে পারে, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া, অথবা ক্ষমতা সংহতকরণের চেষ্টা থেকে হয়তো তিনি ভালো কাজই করেছেন -কিন্তু সে কাজটি করেছেন পার্থিব


www.nagorikpathagar.org

খ্যাতি অর্জনে অথবা নিজে জ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে।

কুরআন বলে :

*"তোমার প্রতিপালক জানেন ইহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে।" (২৮ঃ৬৯)*

*"উহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।" (২৭ঃ ৭৪)*

*"........., বল, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।" ( ২৮ঃ ৮৫)*

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী, উল্লেখিত আয়াতে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহই ভালো জানেন, কার হৃদয়ে কি ছিল বা আছে। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা কুরআনের আয়াত বিশ্বাস না করলেও, তাদেও জন্যও এ যুক্তি অস্বীকারের পথ নেই। কুরআনের এই আয়াতের মূলার্থ যে নিশ্চিত সত্য তা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়পক্ষই অবশ্যই উপলদ্ধি করেন।

কারো মনের খবর কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই ভালো জানেন। কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘসময় ধরে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর কেবল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মে । সেই সাথে এই বৈশিষ্ট্যের সাথে তার 'কথা ও কর্মের' বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে একটি গ্রহণযোগ্য ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ধারণা যে শতভাগ সঠিক সে দাবি কেউই নিশ্চিতভাবে করতে পারেন না। সুতরাং কোনটি ইসলামের বিধি-বিধান আদেশ, উপদেশ, কোনটি নয়, কোনটি কিভাবে করণীয়– সে সম্পর্কে কারো কোন কর্ম, উক্তি, রচনা বা বর্ণনা -'সত্য কি সত্য' নয় তা অবশ্যই কুরআন পাঠে অথবা কুরআনের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা ছাড়া আর কি বিকল্প থাকতে পারে?

সম্ভবত ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক কর্মটি হচ্ছে এসব প্রশ্নের সমাধান। এর সমাধানে আলোচনা, সেমিনার সিম্পোজিয়ান বা প্রবন্ধের জন্য কুরআনই একমাত্র নথি, তথ্যসূত্র উপাত্ত ও দলিল। এ জন্য একাডেমিশিয়ান, স্কলার আলোচক বা প্রবন্ধকারদের জন্য একমাত্র যুক্তিসংগত করণীয় হচ্ছে, কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কাভার-টু-কাভার পুনঃ পুনঃ পাঠ, ঠিক যেভাবে এই গ্রন্থ 'যথাযথভাবে পাঠ' ও এর 'বাণী


www.nagorikpathagar.org

অনুধাবন' করতে বলা হয়েছে সে অনুযায়ী। অতঃপর হাদিস, ইতিহাস, ঐতিহ্য দলিল হিসেবে কার কি অবস্থান সেটি কুরআনের আলোকে নির্ধারণ করা। এভাবে এর মাধ্যমেই ইসলামের কাঠামো, রূপরেখা ও আদর্শ এবং এই সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ ও সে সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্য সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপনের পরবর্তী কাজটি শুরু হতে পারে।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কুরআনের আয়াতের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত 'আল কুরআনুল করিম' থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পাঠকের জন্য আরেকটি বিষয় বিশেষ স্মরণীয় যে, এই গ্রন্থের লেখকের অন্তরে কি আছে, সেটিও আল্লাহ এবং লেখকই ভালো জানেন। সুতরাং এই লেখক যে তার কোন পার্থিব লাভালাভ বা অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে এই গ্রন্থ রচনা করেন নি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য ও বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই-এ পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ 'কাভার-টু-কাভার বারবার কুরআন পাঠ' করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে লেখক আশা করে।

আল্লাহ সত্য বলেন, তিনি অঙ্গীকার করেছেন, তিনিই কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তার অঙ্গীকার রক্ষা করে কুরআন অবিকৃত আকারে এই একাবিংশ শতাব্দিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন এই কুরআনকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে, সে কর্মের দায় প্রধানত বিশ্বাসীদেরই।


www.nagorikpathagar.org

# ২.১ কুরআন

সাধারণ অর্থে বাংলায় 'গ্রন্থ বা বই', ইংরেজিতে 'বুক' এবং আরবি কিতাব হচ্ছে কতগুলো পরস্পর সম্পর্কিত লিখিত পাতার সমষ্ঠী যা সহজে পাঠযোগ্য ও বহনযোগ্য। এই পাতাগুলো হতে পারে বিভিন্ন উপাদানের বা উপাদান-সমষ্টির তৈরি। তবে একটি বইয়ের লিখিত বিষয়বস্তুকে বা বইটি যা ধারণ করছে– সেটিকেও বই বলা হতে পারে। কোন বই-এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা হচ্ছে ঐ বইয়ে লিখিত বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও উপযোগিতার উপরই একটি বইয়ের গুরুত্ব ও উপযোগিতা নির্ভরশীল। কোন বই পাঠ করার পরই কেবলমাত্র ঐ বইটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা উপলব্ধি করা সম্ভব। কোন ব্যক্তি যখন কোন গ্রন্থ পাঠ করেন বা গ্রন্থ পাঠ শ্রবন করেন মূলতঃ ঐ রচনাতে যা বলা হচ্ছে, তিনি তা জানার চেষ্টা করেন। একজন ব্যক্তি যখন একটি গ্রন্থ নিজে পাঠ করছেন বা কারো পাঠ শ্রবণ করছেন, কিন্তু আদৌ কি পাঠ করছেন বা শ্রবণ করছেন তিনি সেসব শব্দের অর্থ জানেন না– বুঝতে পারেন না বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না– তখন তিনি প্রকৃত অর্থে কিছুই পাঠ করছেন না, তিনি কিছু অর্থহীন শব্দ উচ্চারন বা শ্রবণ করছেন মাত্র। তিনি শতবার সে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেন না কেন, তার কাছে সেসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অর্থহীনই। ফলে ঐ বইটি তার কাছে গুরুত্বহীন। তবে যদি সে শব্দের উচ্চারণ সুরেলা বা শ্রুতিমধুর হয়, সেক্ষত্রে হয়ত এ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি তার কাছে অর্থহীন হলেও তার হৃদয়ে এক ধরনের ব্যঞ্জনা হয়তো সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু তা তার জ্ঞানের জগতের কোন পরিবর্তন আনে না। কুরআন পাঠ অথবা শ্রবণের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

পবিত্র কুরআনে 'কুরআন কেন'– কি আছে সেখানে, ইসলাম ধর্মের সাথে আদৌ এর কি কোন সম্পর্ক আছে বা যেসব বিষয়ে বলা হয়েছে তার গুরুত্ব বা উপযোগিতা কতটুকু– এসব প্রশ্নের কুরআন কি বলছে সে উত্তর পেতে হলে অবশ্যয়ই কুরআন পাঠ করেই সে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

লক্ষনীয় যে, পবিত্র কুরআনে 'কুরআন কেন'- এ গ্রন্থের বহু বাণীতে সে প্রশ্নের উত্তর যেমন দেওয়া হয়েছে সেই সাথে এ গ্রন্থের বর্ণিত বাণী, বিধান উপদেশ-ইত্যাদি মানুষের জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সে প্রসঙ্গও বহুভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে 'কুরআন কেন'– এ প্রশ্নে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। এসব আয়াতে, কুরআন কেন দেওয়া হয়েছে তার বহু কারণের মধ্যে যে প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার কয়েকটি :

১. বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ
২. মানুষের জন্য উপদেশ
৩. মানুষের জন্য বিধান
৪. ভালো মন্দের পার্থক্য ও সত্য-অসত্য নির্ধারক
৫. মতপার্থক্য মীমাংসাকারী বাণী
৬. অতীতের সংবাদ
৭. পরম শ্রষ্ঠার প্রতি আত্মসমর্পণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রার্থনা ও কর্মের রীতি-নীতিসহ মানব আত্মা পরিশুদ্ধ করার কৌশল
৮. অদৃশ্যের সংবাদ
৯. এবং উপরে উল্লেখিত সকল বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, উদাহরণ এবং উপমাসহ পূর্ণজ্ঞান

উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত বহু আয়াতের মধ্যে কয়েকটি :

"*এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।" (৪৫ঃ২০)*

"*যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করিয়াছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যয়ই ফিরাইয়া আনিবেন জন্মভূমিতে--। -------।" (২৮ঃ৮৫)*

"*রমাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যা-সত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।------। -----।" (২ঃ১৮৫)*

"*-------। এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের যাহার নিকট ইহা পৌছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা (কুরআন দ্বারা) আমি সতর্ক করি।--------।" (৬ঃ১৯)*


www.nagorikpathagar.org

*"এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ-ওজর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য," ( ৭৭ঃ ৫, ৬)*

*"শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি, এবং শপথ জমিনের যাহা বিদীর্ণ হয়, নিশ্চয় ইহা (আল-কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী। এবং ইহা নিরর্থক নহে।" (৮৬ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪)*

*"পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ।" (২০ঃ ৯৯)*

*"আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।" (১৮ঃ৫৪)*

*"এইরূপেই আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবি ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদের জন্য উপদেশ।" (২০ঃ ১১৩)*

এভাবেই এক অদৃশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা তার নিজের সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান, তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান, মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান, মানুষের কোন কর্মের কি ফলাফল সে সম্পর্কে জ্ঞান দানসহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন।

কুরআন আরো জানাচ্ছে, এই জ্ঞান অর্জন এবং তা নিজ জীবনে সর্বতভাবে প্রতিফলন ও চর্চ্চার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা ব্যতীত -মানুষের জন্য চরম পরিণতি অপেক্ষা করছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কুরআন নিজে পাঠ করে হোক বা কারো পাঠ বা আবৃত্তি শুনে হোক- উল্লেখিত বিষয়ের কোন একটি সম্পর্কে 'কুরআনের জ্ঞান' অর্জন করতে হলে কুরআনের বিকল্প কিছু আছে কি? অথবা ভিন্নভাবে বললে, উল্লেখিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কুরআন পাঠের আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

কুরআন আরো বলে :

*"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য। অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বণ করে সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য*


www.nagorikpathagar.org

*এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ।" (৩৯ঃ৪১)*

*"আল্লাহই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড।" (৪২ঃ১৭)*

*"আল্লাহর নিকট হইতে এক রাসুল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ, যাহাতে আছে সঠিক বিধান।" ( ৯৮ঃ ৩)*

উপরন্ত আল্লাহ সতর্ক করেছেন :

*"আমি রাসুলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।" (৩৬ঃ ৬৯, ৭০)*

সুতরাং কুরআন দাবি করছে, কুরআন কবিতা গ্রন্থ নয় যে কবিতা বা সঙ্গীতের সুরেলা কণ্ঠে এটি পাঠ করে পাঠকের বা শ্রোতার মনে ব্যঞ্জনার উদ্রেককরণই এই গ্রন্থ অবতীর্নের উদ্দেশ্য। কুরআন দেওয়া হয়েছে এ কারণে যে মানুষ প্রধানত যারা বিশ্বাসী তারা এই গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করবেন। যারা এই গ্রন্থকে কবিতার বই-এর মতো গণ্য করে এই গ্রন্থ থেকে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে কবিতার সুরে বা সঙ্গীতের সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে নিজের মনে ও শ্রোতার মনে ব্যঞ্জনার সৃষ্টির কাজটি করছেন, কুরআনের ভাষায় তারা প্রকারন্তরে আল্লাহর প্রিয় রাসুল (সঃ)-কে অশোভনীয়ভাবে উপস্থাপন করার দায়ে অভিযুক্ত। একটি শ্রেণী গত সাড়ে ১৪'শ বছর ধরে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন কাহিনী ফেঁদে এই কাজটিকেই কুরআনের সকল উপযোগিতা হিসেবে অভিহিতকরণ করার মাধ্যম যারা এই ধারাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ যোগাচ্ছেন এই আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করা হয়েছে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন যখন, তা 'যথাযথভাবে পাঠ' ও 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ', 'নিবিষ্ট চিত্তে' বা 'অভিনিবেশ সহকারে' পাঠ ও শ্রবণ করার এবং এ সম্পর্কে 'চিন্তা, অনুধাবন, উপলব্ধি ও হৃদয়াঙ্গম' করার তাগাদা বা উপদেশ দিচ্ছে তখন এই গ্রন্থ যে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য এই আয়াতের ব্যখ্যাটি কুরআন আরো স্পষ্ট করছে, তা বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ এ সম্পর্কে যা বলেন তার মধ্যে কয়েকটি আয়াত :


www.nagorikpathagar.org

*"এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (৩৮ঃ২৯)*

*"তবে কি উহারা কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (৪৭ঃ২৪)*

*"ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার আছে অন্তকরণ অথবা যে শ্রবন করে নিবিষ্ট চিত্তে।" (৫০ঃ ৩৭)*

*"তবে কি উহারা কুরআন সমন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (৪৭ঃ২৪)*

*"যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে ইহা তিলওয়াত করে, তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে; আর যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (২ঃ১২১)*

*"----; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দারা তাহারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না--ইহারা পশুর ন্যায়,------।" (৭ঃ১৭৯)*

*"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই, বধির ও মুক যাহারা কিছুই বোঝে না।" (৮ :২২, ৫৫)*

*"উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে, তাহারা না বুঝিলেও?" (১০ঃ৪২)*

*"উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে তাহারা না দেখিলেও?" (১০ঃ৪৩)*

আল্লাহ বলেন :

*"..........আর তাহারা বলে, আমরা শুনয়াছি এবং পালন করিয়াছি। --------।" (২ঃ২৮৫)*

আল্লাহ আরো বলেন :

*"সুতরাং উহারা ইহার (কুরআনের) পরিবর্তে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?" (৭৭ঃ৫০)*

*"উহাদের কী হইয়াছে যে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ (কুরআন) হইতে ? উহারা যেন ভীত সন্ত্রস্ত গর্দভ, যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।*


www.nagorikpathagar.org

*বস্তুতঃ উহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। না, ইহা হইবার নহে; বরং উহারা তো আখিরাতে ভয় করে না। না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ। অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা (কুরআন) হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।" ( ৭৪ঃ ৪৯-৫৫)*

সুতরাং কেন কুরআন, কি আছে কুরআনে, কেন পাঠ করতে হবে, কিভাবে পাঠ করতে হবে– ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত কুরআনের বর্ণনার পরে কোন বিশ্বাসীকে কি কুরআন পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে?

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম পর্যায়েই আল্লাহ তাহার রাসুলকে জানাচ্ছেন কুরআনের 'সংরক্ষণ ও বিস্তারিত ব্যখ্যার দায়িত্ব' আল্লাহরই :

*"তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্বের জন্য তুমি (রাসুল সঃ) তোমার জিহবা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না, ইহা সংরক্ষন ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর, অতঃপর ইহার বিশদ ব্যখ্যার দায়িত্ব আমারই।" (৭৫ঃ ১৬ঃ ১৯)*

অতঃপর আল্লাহ কুরআনের আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা, কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা– ইত্যাদি প্রসঙ্গে যা বলেন, সে সম্পর্কে কুরআনে যে শতাধিক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি :

*"..........। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদরূপে তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।" (১৬ঃ৮৯)*

*"ইহা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ। এক কিতাব' বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে' ইহার আয়াতসমূহ, আরবি ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং ইহারা শুনিবে না।" (৪১ :২, ৩, ৪)*

*"আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ---------।" (৩০ :৫৮)*

*"আর অবশ্যয়ই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফরি করা ব্যতীত ক্ষ্যান্ত হইল না।" (১৭ :৮৯)*


www.nagorikpathagar.org

*"এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার প্রত্যায়ন ও বিশদ ব্যাখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।" (১০ :৩৭)*

*"ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের জন্য আয়াতসমূহ (নিদর্শন) বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।" (৬ :১২৬)*

*"------। ইহা এমন বাণী, যাহা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআনের বাণী) পূর্ব গ্রন্থে যাহা আছে তাহার প্রত্যায়ন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।" (১২ :১১১)*

*(বল), ---, এই কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে, ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিবে না, অবশ্যয়ই আমি তাহার পক্ষে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (১১ :১,২)*

*"এইভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আর ইহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। (৬ :৫৫)*

আল্লাহ তার প্রিয় রাসুলের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন, কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব তারই এবং তিনি জানিয়েছেন যে তিনি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ পথ নির্দেশসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আরো বলেন কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও বিশদভাবে বিবৃত এবং এই কুরআনের মধ্যেই সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

এবং আল্লাহ তার রাসুলকে বলেন :

*"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।" (৩০ :৩০)*

*"তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।" (৩০ : ৪৩)*


www.nagorikpathagar.org

*"হে মুমিনগণ তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (২ : ২০৮, ২০৯)*

*"যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চায়, ইহা (কুরআন) দ্বারা তিনি তাহাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান। এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (৫ঃ১৬)*

সুতরাং কুরআনের দাবি অনুযায়ী কুরআন পূর্ণাঙ্গ। সেখানে কোন বিষয়ে যাই বলা আছে, অল্প কয়েক কথায় বলা আছে বা বহু বাক্য ব্যয়ে বলা হয়েছে সেটিই মানুষের জন্য যা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং চর্চার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। কুরআনের বিধান, আদেশ উপদেশ-যেভাবে বলা আছে, এই আদেশ উপদেশ পালনে যা বলা আছে যেভাবে পালন করতে বলা আছে– সেটিই বিস্তারিত এবং বিশদ বিবরণ। কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্য চাইলে সে ব্যখ্যাটিও কুরআনেই দেওয়া হয়েছে।

একজন বিশ্বাসী নিজেকে সরল দ্বীনে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে পথনির্দেশ, উপদেশ ও বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন তার সমস্ত কিছুই বিস্তারিতভাবে ব্যখ্যাসহ, উপমা, উদাহরণসহ পবিত্র কুরআনে দেওয়া আছে। আল্লাহ তার রাসুল মুহাম্মাদ (সঃ) এবং কুরআনের আয়াতে কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসী হন, তার জন্য এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কোন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন অথবা যদি বলেন, কুরআনে বিস্তারিত বলা নেই– তিনি মূলত : আল্লাহ তার রাসুল মূহাম্মদ (সঃ) এবং কুরআনের আয়াতকে অবিশ্বাস করছেন অথবা কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতকে অস্বীকার করছেন। দুটি ক্ষেত্রেই ঐ ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অনুসারী হিসেবে দাবি করার অধিকার হারাবেন– এটিই যুক্তিসংগত।

আল্লাহ বলেন :

*"যাহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাহারা বধির, মুক, অন্ধকারে রহিয়াছে। যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি*


www.nagorikpathagar.org

*সরল পথে স্থাপন করেন।" (৬ :৩৯)*

আল্লাহ আরো বলেন :

*"অবশ্য আমি তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা 'পূর্ণজ্ঞান' দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ------। (৭ :৫২)*

*"পরন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার মাধ্যমে। তিনি তাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন ' নিজ জ্ঞানে' এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী দেয়। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ :১৬৬)*

কুরআনের রচনাকারী স্বয়ং দাবি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাশীল, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বোপরি তিনিই সর্ববিষয়ে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা। সুতরাং তার গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বিষয়টি শুধু বিশ্বাসীদের জন্য একইভাবে কোন অবিশ্বাসী যখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইবেন বা ইসলামের কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবেন– সে ইসলামের সমালোচনাই হোক বা অন্য কোন প্রসঙ্গেই হোক, তখন যুক্তিসংগতভাবেই তিনি কুরআনের 'বিবরণ'কেই ভিত্তি হিসেবে ধরে সেটি করবেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কোন ইতিহাস, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য কিম্বা কারো কোন রচনাকে 'ইসলাম' হিসেবে দাড় করিয়ে সমালোচনা করা বা ইসলামকে দায়বদ্ধ করা হবে সাধারণ জ্ঞানে যেমন অযৌক্তিক এবং মূর্খতা তেমনি কুরআনের বর্ণনামতেই সে কাজটি অযৌক্তিক এবং মুর্খতারই শামিল।

কুরআন দাবি করছে, আল্লাহ তার পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুরআনে যা আছে, তিনি নিজ জ্ঞানে তা অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং কুরআনের আয়াতের সাথে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নিজেদের জ্ঞান জাহির করতে কুরআনের আয়তের বাইরের কোন দলিল-দস্তাবেজ তথ্য প্রমাণ, ঘটনার বর্ণনা এবং উদাহরণ-উপমা দিয়ে কুরআনের কোন আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার কাজটি যখন করেন তিনি প্রকারন্তরে আল্লাহর জ্ঞানকেই চ্যালেঞ্জ করেন।

যখন বলা হয়, কুরআনে সরল দ্বীনে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট বা বিস্তারিত বলা হয়নি এবং এই দাবির সঙ্গে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, রীতি-নীতি, উপদেশের সাথে যারা নিজেদের নতুন নতুন আইন, বিধান,


www.nagorikpathagar.org

রীতি-নীতি, উপদেশ ইসলামের অংশ বা শরিয়ত হিসেবে দাবি করে ফতোয়া দেন, মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন- তারা তাদের জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক কুরআনের বর্ণনামতে মূলত : আল্লাহর জ্ঞানকেই চ্যালেঞ্জ করছেন।

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত এবং উল্লেখিত আয়াত সবগুলো একত্রে কুরআন কি ও কেন এবং ইসলামের সাথে তার সম্পর্কটি কি সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এই সাথে যদি আমরা কুরআনের মনুষ্য ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি বহুল আলোচিত আয়াত সেগুলোর সাথে যোগ করি তবে সম্ভবত এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাখ্যাটি আরো স্পষ্ট হয়। একই সঙ্গে কুরআন থেকেই এই আয়াতটিরও একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন :

*"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কিছু আয়াত মুহকাম, এইগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ, যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত'; এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অন্য কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" (৩ :৭)*

কুরআন ও ইসলাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত– কুরআনের এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি ইতোমধ্যেই স্পষ্ট। এ পর্যায়ে যদি নিচের আয়াতটি যোগ করা হয় তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটি আরো স্পষ্ট হয় :

*"----। ---। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম।----। ---।" (৫ :৩)*

সুতরাং 'ইসলাম' পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনও পূর্ণাঙ্গ। কোন পূর্ণাঙ্গ বিষয়, সে কোন কাঠামোই হোক অথবা কোন রচনাই হোক, তার নির্মাণকারী বা রচনাকারী যখন ঘোষণা দেন তার কর্মটি পূর্ণাঙ্গ তখন সেই কাঠামো বা রচনা পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা করেই সে কাঠামোর বা রচনার বিষয় বিবেচনা করেই তার মূল্যায়ন করাটিই যৌক্তিক। তার সাথে কোন কিছু


www.nagorikpathagar.org

সংযোজন বা বিয়োজন সে কাঠামো বা রচনার মৌলিকত্ব খর্ব, অঙ্গহানি, সৌন্দর্য বিনাশসহ বহু বিষয়ে ত্রুটিযুক্তকরণ হতে পারে। সে কাজটি করা হলে তার দায়-দায়িত্বও আর মূল কাঠামো নির্মাণকারী বা রচনাকারীর ওপর বর্তায় না। বিশেষ করে, যখন কোন কাঠামোর নির্মাণকারী বা কোন রচনার রচনাকারী নিজেই এই সংযোজন, বিয়োজন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দেন- তখন এ সম্পর্কে কারও আর করণীয় কিছুই থাকার কথা নয়। পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরো কঠোরভাবে প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। প্রথমত : এই গ্রন্থের রচনাকারী তার গ্রন্থের কোন বাণীর সাথে কিছু সংযোজন, বিয়োজন, বিকৃতিকরণ বা কোন বাণী আচ্ছাদন করার কাজটি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ– এই একই গ্রন্থে কখনো সরাসরি কখনো বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা, উপমা অতীতের অভিজ্ঞতা ও উদাহরণসহ বারবার কঠোরভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং একটি গ্রন্থ যখন নিজেই এসব কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার হুঁশিয়ারি দেয়, তখন সে গ্রন্থে বর্ণিত ধর্মের কাঠামোর ক্ষেত্রে সেটি মেনে চলা নীতিগতভাবে যুক্তিসংগত। সুতরাং কুরআনে বা ইসলাম ধর্মে নতুন করে কোন বিধান, রীতি-নীতি উপদেশ, ব্যাখ্যা যোগ করার বা বিয়োজন করার কোন সুযোগ নাই।

আল্লাহ বলেন :

*"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, তাহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (৬ঃ১১৫)*

*"নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট আয়াত (নিদর্শন) ও হিদায়াত অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা "স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহাদিগকে লানত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাহাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (২ঃ১৫৯ এবং ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬)*

*"অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল খুশি দ্বারা অবশ্যয়ই অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্মন্ধে সবিশেষ অবহিত।" ( ৬ঃ ১২০)*

*"যে ব্যক্তি আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিম্বা তাহার আয়াতকে অস্বীকার*


www.nagorikpathagar.org

*করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে ? ----- । --- ।" ( ৭ :৩৭)*
*"এইরূপে আমি মানব ও জ্বীনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদের এক অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে।--------। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে ও তাহাদের মিথ্যা রচনা বর্জন কর। আর তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মন যেন উহার প্রতি অনুগামী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহাই যেন করিতে থাকে।" ( ৬ :১১২,১১৩)*

ঠিক যে ক্ষণে আল্লাহ 'কুরআন ও ইসলাম' পূর্ণাঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, ঠিক সেই ক্ষণটি থেকেই 'কুরআন ও ইসলাম' তার একই কাঠামো ও রচনা নিয়ে স্বমহিমায় তার স্থানে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এই কাঠামো ও রচনায় কোন পরিবর্তন নেই-সেটিই যুক্তিসংগত।

সুতরাং মানুষের সাধারণ জ্ঞানে যুক্তিসংগত হওয়া স্বাভাবিক যে, এই কাঠামো ও রচনার আওতায় থাকার অঙ্গীকারকারী বা এর মহিমা ঘোষণার নামে অথবা এটির বর্জনে বা বিরোধিতার মাধ্যমে মানুষ কি করেছে, সেটি মানুষের নিজস্ব কর্ম। মানুষের এসব কর্মের মাধ্যমে ইসলামে কোন কিছু যোগ বা বিয়োজন হওয়ার কোন কারণ নেই বা ঘটেওনি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফা মদিনার শাসনভার গ্রহণ করে যা করেছেন, সে কর্মের দায়ভার তাদের। সে সময় অন্যেরা যা করেছেন, সে কর্মের দায়ভারও তাদেরই। এতে ইসলামে কোন কিছু যোগও হয়নি বা সে সময়ে কোন কর্মে বা কারো ইচ্ছায় ইসলামে কিছু বিয়োজনও ঘটেনি। একই উক্তি ইসলামের নামে পরবর্তী শাসকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, ইমাম, আলেম, মুহাদ্দেস, ফকিহ, বা স্কলার– যে নামেই কোন ব্যক্তিকে অভিহিত করা হোক না কেন- তিনি এক হাজার বছর আগে জন্মেছেন বা বর্তমানে জীবিত– সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য হবে– কুরআনের ব্যাখ্যার আলোকে সেটিই কি যুক্তিসংগত হওয়ার কথা নয়?

সুতরাং কুরআনই ব্যাখ্য দিচ্ছে, ইসলাম ও কুরআন স্বমহিমায় একই স্থানে একইভাবে অবস্থিত । মানুষের কেউ কুরআন পাঠ করছেন, কুরআনের আয়াত অন্যজনের কাছে পৌঁছাচ্ছেন এবং নিজে সে উপদেশ পালন


www.nagorikpathagar.org

করছেন– কেউ আবার ভিন্ন কিছু করছেন- কে কিভাবে করছেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলামে প্রবেশ করছেন কি-না– সেটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব কর্ম, তার নিজের লাভ-ক্ষতির বিষয়, তার কোন কর্মের দায়-দায়িত্ব যেমন আল্লাহ ও তার রাসুলের নয় এবং তার কোন কর্মে ইসলামের কাঠামোর সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি বা উজ্জ্বলতা-নিষ্প্রভতার কোন বিধান আল্লাহর রাসুল কুরআনে সংকলিত করেননি।

আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক মানুষই তার নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। সুতরাং কুরআন ও ইসলামের নামে কারো কর্ম, রচনা, মাজহাব, ব্যখ্যা, বিশ্লেষণ সেটি যার যার কর্ম দায়ভারও তারই। অন্য কোন ব্যক্তি সে দায়ভার বহন করবে না। আল্লাহ, ইসলাম বা আল্লাহর নবী-রাসুলগণ তো নয়ই।

এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত আছে তার মধ্যে কয়েকটি :

*"আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।" (৭৬ঃ ৩)*

*"..........-। প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।" (৬ঃ১৬৪)*

*"তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করিবে এবং মন্দ কর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য।---------।" (১৭ঃ৭)*

*"যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য এবং কেহ কাহারও ভার বহন করিবে না।------। (১৭ঃ১৫)*

*"যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন ইহারা শংকামুক্ত থাকিবে।" (২৭ঃ৮৯)*

*"যে কেহ অসৎকর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে দোজখে এবং (উহাদেরকে বলা হইবে), 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হইতেছে।" (২৭ঃ৯০)*

*"যে কেহ সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হয় তাহার তাহার জন্য রহিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল, আর যে মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হয়, তবে যাহারা মন্দ*


www.nagorikpathagar.org

*কর্ম করে তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিয়াছে উহারই শাস্তি দেওয়া হইবে।" (২৮ঃ৮৪)*

*"যে কেহ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ হইতে অমুখাপেক্ষি।" (২৯ঃ৬)*

সুতরাং কারো কর্ম যে কুরআনের অংশ তো নয়ই, বরং ইসলামেরও কোন অংশ নয়– যার যার কর্ম তার তার-সে ব্যাখ্যাও আল্লাহ্ কুরআনে স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষকে কুরআনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন মানুষের উল্লিখিত কর্ম যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম বলে বিবেচিত হয়, তার শুভ ফলাফল সে কর্মের অধিকারীই ভোগ করবেন কিন্তু যদি মন্দ বলে বিবেচিত হয় সে মন্দের দায় ভারও তারই। আল্লাহ্ বলেন কে সৎকর্মপরায়ন বা কে মন্দকর্ম করেছে বা করছে তিনিই ভালো জানেন এবং এর চূড়ান্ত বিচারকও তিনি এবং রায়ও তিনিই দেবেন।

তবে যে বিষয়ে আল্লাহ স্পষ্টভাবে সনদ প্রদান করেননি অর্থ্যাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি বা দিক নির্দেশনা দেননি সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ তার চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় ব্যবহার করে অর্থাৎ তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে পরখ করে, সেসব বিষয়ে যেটি উত্তম মনে করবে, সেটিই সে আমল করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সে উপদেশই প্রদান করেছেন। মানুষ এসব বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

মানুষের সিদ্ধান্ত কখনো চিরন্তন নয়। মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কোন বিষয়ে কোনটি তার জন্য উত্তম– সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন সময়, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির ওপর তার নিজস্ব ভালো-মন্দ বহুলাংশে নির্ভর করে তেমনি সময়ের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি বৃদ্ধির ফলেও তার জন্য পূর্বের সিদ্ধান্তের তুলনায় আরো উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উপায় রয়েছে।

মানুষের সামনে ইসলামের যে চিরন্তন কাঠামো ও ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী স্পষ্ট চিরন্তণ বাণী, 'ফুরকান' স্বমহিমায় অবস্থান করছে- তা পাঠে প্রকৃত ইসলাম এবং গত ১৪'শ বছরে ইসলামের নামে বা ইসলামের বর্জন ও


www.nagorikpathagar.org

বিরোধিতার নামে কে কি করছেন সে সম্পর্কে যদি বিশ্বস্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তাহলে– এ দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ শেষে মানুষ এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পেতে পারে মাত্র।

ইসলামের বিধান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান। আল্লাাহ্র বিধানের কোন পরিবর্তন নেই। সুতরাং মানুষের কোন সিদ্ধান্ত ইসলামের কোন বিধি-বিধান নয়। নীতি-রীতি, বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্ত মানুষেরই কর্ম। 'ইসলাম' নামে বা 'আল্লাহর বিধান' নামে তার প্রচার-প্রচারণাও কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। আর যা আল্লাহর আয়াতের পরিপন্থী আল্লাহর দৃষ্টিতে তা গর্হিত অপরাধ।

"*তাহাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সমন্ধে কোন জ্ঞান নাই তাহারা শুধু অমূলক কথা বলে। সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়োছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে উহার জন্য শাস্তি তাহাদের।" (২ঃ ৭৮, ৭৯)*


www.nagorikpathagar.org

## ২.২ ভাষা

ভাষার কি কোন ধর্ম আছে? অথবা কোন একটি ধর্ম চর্চ্চার জন্য কি কোন একটি ভাষা ঐ ধর্মে নির্দিষ্ট করা হয়েছে? বিশেষ করে ধর্ম আলোচনার বিষয়বস্তু যখন ইসলাম !

'ভাষা' কি?

একদম সাদামাটা ভাবে বললে, ভাষা একটি মাধ্যম মাত্র, যা 'বার্তা' বহন করে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেয়।

ইতিহাস ও ভাষাবিদদের মতে বর্তমান বিশ্বে তিনটি প্রধান ধর্ম : ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামের, পৃথক তিন প্রবর্তকের তিনজনই অ্যারামিক ভাষা থেকে উদ্ভুত তিনটি পৃথক ভাষা, যথাক্রমে 'ইজিপশিয়ান অ্যারামিক' বা 'ইজিপশিয়ান হিব্রু ', 'অ্যারামিক বা অ্যারামিক হিব্রু' এবং 'আরাবি ভাষায়' কথা বলতেন। তিনিটি ভাষার মূল বা গোড়া এক হলেও সবগুলো ভাষাই স্বতন্ত্র ভাষা। মুসা (আঃ)--এর ইজিপশিয়ান অ্যারামিক বা ইজিপশিয়ান হিব্রু, ঈসা (আঃ)-এর অ্যারামিক বা অ্যারামিক হিব্রু এবং কুরআনে উল্লেখিত ইবরাহীম (আঃ) অথবা অন্য কোন নবী-রাসুল - যে ভাষায়ই কথা বলতেন তা কুরআনের ভাষা আরাবি নয়। কুরআন নিজেই এই ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা করছে এভাবে :

*'আমি প্রত্যেক রাসুলকে তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি। তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, --------- ।' (১৪ :৪)*

সুতরাং কুরআনের বর্ননা এবং ইতিহাস ও ভাষাবিদদের গবেষণালদ্ধ তথ্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ আরো বলেন :

*"আর তাহার আয়াতের (নিদর্শনাবলীর) মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যয়ই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।" (৩০ :২২)*

গবেষণালদ্ধ জ্ঞান অথবা কুরআনে বিশ্বাসী– যিনি যে তথ্যের উপরই নির্ভর



www.nagorikpathagar.org

করুন না কেন, সকল পক্ষই এ বিষয়ে একমত হবেন যে, কুরআনে উল্লেখিত রাসুল ও নবীগণ সবাই একই ভাষা-ভাষী বা আরাবি ভাষী ছিলেন না। প্রত্যেক নবী রাসুল তার নিজ সম্প্রদায়ের মুখের ভাষায় ঐশ্বরিক বাণী প্রচার করেছেন।

এক 'অদৃশ্য সর্বশক্তিমান সত্ত্বার বার্তা মুহাম্মাদ (সঃ)-আরাবি কুরআনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছান, মুসা (আঃ)-কে--তেমনই এক সত্ত্বার বাণী পৌঁছে দেন ইজিপশিয়ান হিব্রু ভাষায় এবং ঈসা (আঃ)-কে পৌছান অ্যারামেইক ভাষায়। ঠিক একইভাবে ইব্রাহীম (আঃ) বা অন্য সকল– নবী রাসুল- তেমনই সত্ত্বার বাণী পেয়েছেন তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাতৃভাষায়।

এই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উচ্চারণে যে পরম সত্ত্বার - 'তাদের' মধ্যে আদৌ কি কোন সম্পর্ক আছে ? পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে কি বলছে?

*"--------- । -------- । এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের (কিতাবী -ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান) প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাহার প্রতি আত্মসমর্পণকারী।" (২৯ :৪৬)*

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াহুদিদের ইলাহ্, খ্রিষ্টানদের ইলাহ এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ইলাহ্- একই ইলাহ্। যে ভাষায় যে নামেই তিনি অভিহিত হন- কুরআনের ব্যাখায় ইলাহ্ একজনই। কিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ) এর মাতৃভাষা আরাবিতে সে একই ইলাহ আল্লাহ, রব; মুসা (আঃ) হিব্রু ভাষায় সে ইলাহ, এডনাই' বা 'ইয়াহওয়েহ' ইসা (আঃ) এলহিম বা জার্মানিক-ইংরেজি ভাষায় 'গড' হিসেবে উচ্চারিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, যা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রভু।

কুরআনই মানবজাতিকে জানাচ্ছে, মানুষের 'একমাত্র ইলাহ' তিনিই ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ), মুহাম্মাদ (সঃ)সহ সকল নবী-রাসুলকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় 'পরম সত্ত্বার নামসহ তারই উপদেশ ও প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। এই নবী-রাসুল একই 'পরম সত্ত্বাকে' তাদের নিজ নিজ ভাষায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ কারণে আল্লাহ অখুশি হননি। বরং তিনিই বলেন, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন– সুন্দর


www.nagorikpathagar.org

সব নাম তারই।

কুরআনের উল্লেখিত আয়াত খুব সরলভাবে কিন্তু শক্ত যৌক্তিক প্রাথমিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে 'এক পরম সষ্টিকর্তা'ই তার সৃষ্ট প্রতিটি জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মাতৃভাষায় তার বাণী পাঠ ও তার কাছে প্রার্থনা করার অধিকার দিয়েছেন।

কুরআনই ব্যখ্যা দিচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই 'একই পরম সত্ত্বা' বিভিন্ন পর্যায়ে নবী-রাসুল প্রেরণ করছেন। সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্য অনুযায়ী কোন একক পরম সত্ত্বা বুঝাতে প্রত্যেক ভাষায়ই একটি বা একাধিক শব্দ থাকা খুবই সংগত।

আধুনিক ভাষাবিদদের মতে, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষারই উদ্ভব পূর্ববর্তী কোন না কোন ভাষার অপভ্রংশ থেকে এবং কালের প্রবাহে তা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। কোন শক্তিশালী ভাষাই সয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্য ভাষার অপভ্রংশ থেকে যেমন কোন ভাষার উদ্ভব এবং সে ভাষার চলার পথে অন্য ভাষার শব্দসমূহ তাকে গ্রহণ করতে হয়। ভাষার উদ্ভবের পর একটি নির্দিষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর তার ব্যাকরণ বা পঠন-পাঠন রীতি জন্মলাভ করে। আরাবি ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাসবিদদের মতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহু বছর পরে মূলত : আরাবি ভাষার ব্যকারণ রীতি-নীতির উদ্ভব।

ভাষাবিদদের মতে 'ইলাহ' শব্দটি উল্লেখিত তিন ভাষাতেই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। এবং উল্লেখিত তিন গ্রন্থেই এই শব্দটি 'পরম এক সত্ত্বা' এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদদের কারো কারো মতে 'আল্লাহ' শব্দটিও কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকেই আরাবি ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ের আরবের মুশরিক, মুর্তিপূজক কাফির যারা 'পরম একক সত্ত্বার' সাথে অন্য প্রভুকেও শরীক করত তারা এবং অন্যান্য ধর্মানুসারীরাও 'পরম প্রভু' অর্থেই ব্যবহার করত। আবার কারো কারো মতে 'আল্লাহ' শব্দটি কুরআনের একান্তই নিজস্ব শব্দ এবং আল্লাহ শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এই 'পরম সত্ত্বার সাথে কোন শরিক নেই' সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তবে আরাবি 'আল্লাহ' শব্দটি যে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী কাফিররাও ব্যবহার করত সে বর্ণনা কুরআনেই আছে। তার একটি উদাহরণ :


www.nagorikpathagar.org

*"তুমি যদি ইহাদিগকে (মূহাম্মদ সঃ-এর সম্প্রদায়ভুক্ত কাফিরগণ) জিজ্ঞাসা কর আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যয়ই বলিবে আল্লাহ। বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? ---- ।" (৩৯ :৩৮)*

সুতরাং এই আল্লাহ শব্দটির ক্ষেত্রেও কুরআনের তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইতিহাস ও ভাষাবিদদের দাবি এডনাই বা 'ইয়াহওয়েহ, এলহিম বা 'গড', লর্ড, প্রভু - প্রতিটি শব্দই বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসীরাও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখন কুরআনে বিশ্বাসীরা এই শব্দগুলোর কোনটি ব্যবহার করেন, এমনকি তারা যখন বাংলায় 'প্রভু' শব্দটিও ব্যবহার করেন তার অর্থ একটিই 'শরিকবিহীন পরম সত্ত্বা'। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার বিশুদ্ধ অন্তর দিয়ে নিজস্ব ভাষায় অর্থবোধক কোন শব্দ উচ্চারণ করে যা বুঝাতে চাইছেন- সেটিই হৃদয়ের প্রকৃত কথা। কিন্তু কথপোকথনে কোন শব্দ উচ্চারণের সময় শব্দ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। একই ভাষায় একই উচ্চারণ কিন্তু ভিন্ন বানানে অর্থের ও ভিন্নতা রয়েছে এমন বহু শব্দ আছে। আবার একই শব্দের ভিন্ন অর্থ রয়েছে। সুতরাং যে ভাষায়ই ব্যবহার করা হোক না কেন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার বিষয়টিও মনে রাখতে হবে।

ভাষার ক্ষেত্রে কুরাআনের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট হয় উল্লেখিত আয়াতগুলোর সাথে নিচের আয়াতসমূহ যোগ করলে।

আল্লাহ বলেন :

*"আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহরই। তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বমক্তিমান।" (২ :২৮৪)*

*"..........; তাহাদের অন্তরে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ সম্যক অবগত।.......... ।" (১১ :৩১)*

কুরআনে নূহ (আঃ) ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) সহ বহু নবী-


www.nagorikpathagar.org

রাসুলের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব বর্ণনার বহুল অংশজুড়ে তাদের সরাসরি উক্তি (Direct Speech) ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু তাদের কেউ আরাবি ভাষী ছিলেন না সুতরাং নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে এই 'মূল উক্তি' যে ভাষায় করা হয়েছিল আল্লাহ স্বয়ং তার আরাবি অনুবাদ মুহাম্মাদ (সঃ) এর কাছে পৌঁছান।

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নবী-রাসুল সম্পর্কিত উপদেশ ও বর্ণনার ধরন দেখলে আরেকটি ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়, মুহাম্মাদ (সঃ) এর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ মূল উক্তিগুলো আরবিতে না হলেও মহান আল্লাহর কাছে সে উক্তিগুলো কত প্রিয় যে, তিনি সেসব উক্তি তার প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার অনুসারীদের জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয় করেছেন এবং সেগুলো পবিত্র উদাহরণ হিসেবে হুবহু আরাবি ভাষায় রূপান্তর করে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

মুসা (আঃ) এর গ্রন্থ, ঈসা (আঃ)-এর গ্রন্থ বা বাণী যে নবী-রাসুল বিভিন্ন সময়ে তাদের স্বজাতির মধ্যে স্ব-স্ব ভাষায় প্রচার করেছেন (যাদের অনেকের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আবার বহু গ্রন্থে নবীর প্রসঙ্গ আছে তাদের নাম উল্লেখ করা হয় নি) কুরআনের দৃষ্টিতে এগুলোর সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্কটি কি– এ ব্যাখ্যাটিও পাওয়া যায় কুরআনের আয়াত থেকে।

আল্লাহ বলেন :

*"এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার প্রত্যয়ন ও বিশদ ব্যাখ্যা। ------ ।" (১০ :৩৭)*

*"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যয়ণকারী ও সংরক্ষকরূপে।------- ।" (৫ :৪৮)*

*'ইহাই (কুরআন) আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' -------- ।' (মুহাম্মাদ সঃ-এর উক্তি- ২১ :২৪)*

*"তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মুসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, ------?' (৫৩ :৩৬,৩৭ এবং মুসা (আঃ) ও ইবরাহীম আঃ-এর কিতাবে যে বিষয় ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই*


www.nagorikpathagar.org

*সুরার ৬২ আয়াত পর্যন্ত। এগুলো রাসুল সঃ-এর উম্মতদের জন্যও বাধ্যতামূলক পালনীয় উপদেশও)*

*'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে- ইবরাহীম ও মুসার গ্রন্থে।' (৮৭ঃ ১৪-১৯, ইবরাহীম ও মুসার গ্রন্থে- আল্লাহকে স্মরণ, সালাত ও পবিত্রতা অর্জন)*

*"তোমার পূর্বে আমি ওহিসহ পুরুষই (মানুষই) প্রেরণ করিয়াছিলাম-- স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।" (১৬ঃ৪৩, ৪৪, লক্ষ্য করুন, কুরআনের পূর্বেবর্তী গ্রন্থে কি ছিল তা মানুষকে জানানোর জন্য)*

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যে স্পষ্ট ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় : কুরআনের 'মূল বাণীগুলো' নতুন কোন বাণী নয় এবং সে বাণী শুধু আরাবি ভাষার নয়, একই বাণী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনুষ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বর্ণের মানুষদের জন্য তিনি তাদেরই নিজ নিজ ভাষায় 'একই বার্তা বা উপদেশ, আদেশ নির্দেশ, ভালো-মন্দের নির্দেশিকা' ঐ জাতিসহ সমগ্র মানবজতির জন্যই পাঠিয়েছেন। ঐ সকল জাতির যার যার নিজস্ব ভাষার শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তার নিজ 'নাম' প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর আদেশ মান্য করে ঐসব জাতি ও ভাষাভাষী লোকজনের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন বা মুসলিম তারা তাদের নিজ নিজ ভাষায় ইবাদত ও প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ তাদের বহুজনকে কবুলও করেছেন– সে উদাহরণও কুরআনে দিয়েছেন।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যখন কুরআনই জানাচ্ছে যে কেন কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে :

*"পাছে তোমরা বল, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পাঠন-পঠন সম্মন্ধে তো গাফিল ছিলাম; ------।" ( ৬ঃ ১৫৬)*


www.nagorikpathagar.org

*"আমি যদি ইহা (কুরআন) কোন আ'জামীর (মুহাম্মাদ সঃ-এর জনগোষ্ঠীর নিকট অচেনা ভাষা-ভাষী) প্রতি অবতীর্ণ করিতাম এবং উহা সে ইহাদের নিকট পাঠ করিত, তবে উহারা উহাতে ঈমান আনিত না।" (২৬ঃ ১৯৮, ১৯৯)*

*"আমি যদি আজমী (ভাষায়) কুরআন অবতীর্ণ করিতাম তবে উহারা অবশ্যয়ই বলিত ইহার আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন? ইহা তো আশ্চর্য ইহার ভাষা আজমী, অথচ রাসুল আরবীয়! -----।" ( ৪১ঃ ৪৪)*

*"ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবি ভাষায়, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" (১২ঃ২)*

*'এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবি ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। -----।' (৪২ঃ৭)*

*"কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হইতে, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে তাহারা গাফিল।" (৩৬ : ৫,৬)*

তবে বার্তা বহনের ক্ষেত্রে ভাষার কিছু কঠিন সীমাবদ্ধতা আছে। যে কোন ভাষার বার্তা বহন করার প্রধান উপকরণ হচ্ছে ঐ ভাষার নিজস্ব শব্দ সম্ভার। কোন প্রেরক তার বার্তা প্রেরণে কোন একটি শব্দ ব্যবহার করে যে বার্তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চান– এমনও হতে পারে গ্রাহক তার থেকে ভিন্ন কোন বার্তা প্রাপ্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে যেমন বার্তার গ্রাহক ও প্রেরকের জ্ঞানের সামঞ্জস্যতা ও বৈপরীত্য একটি সমস্যা তেমনি একই ভাষার মধ্যে বিভিন্ন সমার্থক শব্দ, শব্দের উচ্চারণে শুদ্ধতা বা একই শব্দের ব্যবহার কৌশল ও বিভিন্ন অর্থ বড় সমস্যা হতে পারে। সেই সাথে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ভাষান্তরও প্রকৃত বার্তা সংরক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এ সম্পর্কেও কুরআনই ব্যাখ্যা দিচ্ছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহের সাথে নিচের আয়াতটি যোগ করলে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে আরো স্পষ্ট হচ্ছে :


www.nagorikpathagar.org

*"হে মু'মিনগণ! 'রা'ইনা' বলিও না বরং 'উনজুরনা' বলিও এবং শুনিয়া রাখ কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" (২ :১০৪)*

উপরের আয়াতে 'রাইনা' ও 'উনজুরনা' একই আরাবি ভাষার শব্দ। কিন্তু কুরআনের উপদেশ, 'রাইনা' শব্দটি ব্যবহার না করে উনজুরনা শব্দটি ব্যবহারের।

আরবি রা'ইনা শব্দের প্রায় একই উচ্চারনে দুটি ভিন্ন মূল থেকে উৎপত্তি দুটি ভিন্ন শব্দ এবং ভিন্ন বানানে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। দুটিই আরাবি শব্দ। একটি অর্থ হচ্ছে 'আমাদের দিকে খেয়াল করুন'। অন্য অর্থটি 'ওহে বোকা'। উনজুরনা শব্দের অর্থ স্পষ্ট, 'আমাদের দিকে খেয়াল করুন'। মূলত এই আয়াতে যেসব শব্দের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক, শ্রোতা ভুল বুঝতে পারে- সেসব শব্দ উচ্চারণের সময় বর্জন করে স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার ব্যাখ্যাটি কুরআন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।


www.nagorikpathagar.org

# ২.৩ অনুবাদ

মানব ইতিহাসের সর্ব পর্যায়েই এক জাতি অন্য জাতির অর্জিত জ্ঞানের সুফল গ্রহণের চেষ্ট করেছে। এ সুফল গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে প্রধানত দুটি উপায়ে। একদিকে ভিন্ন জাতির অর্জিত জ্ঞান সরাসরি ব্যবহার করার মাধ্যমে অন্যদিকে এই জ্ঞান নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে। যে কোন যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হলো, ভাষার ব্যবহার। কিন্তু আন্তর্জাতির মধ্যে যোগাযোগের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে, জাতিতে জাতিতে ভাষার ভিন্নতা। বিশ্বে এ সমস্যা উত্তরণে বহুল ব্যবহৃত উপায় হলো, ট্রানশ্লেসন বা অনুবাদ।

পণ্ডিতদের একদল মনে করেন, অনুবাদ একটি বিজ্ঞান। আবার অনেকেই এটিকে 'শিল্প' হিসেবে দাবি করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতামত এটি বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয়।

কুরআন দাবি করে, 'কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ জ্ঞান' অবতীর্ণ করেছেন। এ 'জ্ঞান' মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের তবে এ 'জ্ঞান' শুধু তাদের একার জন্যই নয়– এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য :

*"উহাদের নিকট 'জ্ঞান' আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পারিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়---- । ------- ।----- ।" (৪২ :১৪)*

*"তাহাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্মন্ধে কোন 'জ্ঞান' নাই তাহারা শুধু অমূলক কথা বলে। ---- ।" (২ :৭৮)*

*"যাহাদিগকে 'জ্ঞান' দেওয়া হইয়াছে, তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।" ( ৩৫ :৬)*

যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চায়, ইহা (কুরআন) দ্বারা তিনি তাহাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে 'অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে' লইয়া যান। এবং উহাদিগকে



www.nagorikpathagar.org

সরল পথে পরিচালিত করেন। (৫ :১৬)

*"যদি তাহারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ, ইহা (কুরআন) তো আল্লাহর 'জ্ঞান' (ইলম) মোহাবেক অবতীর্ণ এবং ----- । ------ ।" (১১ :১৪)*

*"এইগুলো 'জ্ঞানগর্ভ' কিতাবের আয়াত,----" (৩১ :২)*

*"কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যয়ই এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।" (৪৩ :৪৪) এবং*

*"ইহা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।" (৩ :১৩৮)*

*"------, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার আলোতে, তাহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ," (১৪ :১)*

*"ইহা তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র । ইহার সংবাদ তোমরা অবশ্যয়ই জানিবে, কিয়ৎকাল পরে।" (৩৮ : ৮৭, ৮৮)*

যেহেতু কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, এই জ্ঞান মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের কিন্তু এই জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির জন্য- সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে এই জ্ঞানের ব্যবহার ও তা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের জন্য বিশ্বে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি রূপে 'অনুবাদ'-ই যুক্তিসংগত হওয়ার কথা।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের অনুবাদের বিষয়ে একশ্রেণীর স্কলারের ভিন্নমতও আছে। তাদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে, অনুবাদে শতভাগ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায় না, সুতরাং অনুবাদের ফলে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু এটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ সুতরাং তা অবিকৃতভাবে রাখার জন্য আরাবি ব্যতীত এই গ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় রূপান্তর সঠিক নয়। এ যুক্তির প্রথম দুর্বলতা হচ্ছে : কোন পাঠকের পক্ষেই কোন গ্রন্থ পাঠ করে লেখক ঠিক ঐ গ্রন্থে যে অর্থ বা যে অনুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার শতভাগ গ্রহণ বলা যায় অবাস্তব ধারণা। সুতরাং কুরআনের কোন পাঠক তিনি আবারী ভাষাভাষী হোন আর বিশ্বের অন্য ভাষাভাষী হোন, মূল আরবিতে কুরআন পাঠ করেও তার শতভাগ গ্রহণ অবাস্তব ধারণাই।


www.nagorikpathagar.org

তবে আল্লাহ বলেন :

*"নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহন করিবে"। -------। (৮৪ঃ ১৯)*

দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে : এই সব স্কলারদের স্ববিরোধিতা। এই স্কলাররাই যখন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করছেন বা কোন একাডেমিক আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে আলোচনায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন, তারা কুরআনের একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন আয়াত নিজের মতো করে অনুবাদ করে তার সাথে নিজের চিন্তা বা ধারণাপ্রসূত শত শত বাক্যজুড়ে দিয়ে শ্রোতাকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাদান করছেন যা শুধু ইসলাম সম্পর্কে আরো বহুগুণ বেশি বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করছে।

তৃতীয়ত : কুরআনের বাণী অনুযায়ী রাসুল প্রেরণ করার অন্যতম প্রধান কারণ 'প্রচার করা'। রাসুলের অনুসারীদের জন্যও প্রচার করা তাদের অন্যতম 'কর্তব্য' এবং প্রচারের প্রধান বিষয় কুরআন এবং কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান :

*"উহাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাহাদের নয় যাহারা তাকওয়ায়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের 'কর্তব্য' যাহাতে উহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।" (৬ :৬৯)*

*"তুমি ইহা (কুরআন) দ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও যাহারা ভয় করে যে, .........., ------- হয়তো তাহারা সাবধান হইবে।----- ।" (৬ :৫১)*

*"------এবং ইহা (কুরআন) দ্বারা তাহাদেরকে উপদেশ দাও---------।" (৬ :৭০)*

*"কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের 'আয়াতসমূহ' স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? -------।" (১৮ : ৫৭)*

সুতরাং রাসুল (সঃ) এর কোন অনুসারী যখন ভিন্ন ভাষাভাষী তার নিজ সম্প্রদায় অথবা ভিন্ন ভাষাভাষী অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন বা অবহিত করবেন তখন তার প্রধান কর্ম হবে তাদের নিকট 'কুরআন' পাঠ বা কুরআন থেকে উপদেশ প্রদান। প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সম্প্রদায়ের কাছে আরাবি ভাষায় দক্ষ না হলে কুরআন পাঠ বা কুরআনের উপদেশ উচ্চারণ আদৌ কি কোন উপদেশ প্রদান করা হয়? সুতরাং কুরআনের



www.nagorikpathagar.org

উপদেশ ঐ ভাষায় অনুবাদ ব্যতীত আর কি কোন পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের কাছে উপদেশ পৌঁছান যায় ? ঐ ভাষা-ভাষীরা যদি বলেন, আমরা আরবি পঠন-পাঠন সম্পর্কে গাফিল ছিলাম, তাহলে তাদের কি আদৌ দায়ী করা যায়?

আল্লাহ বলেন :

*"-----, পাছে তোমরা বল, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সমন্ধে তো গাফিল ছিলাম;' কিম্বা তোমরা বল, 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম।" ----- (৬ :১৫৫, ১৫৬, ১৫৭)*

আল্লাহ আরো বলেন :

*"মু'মিনদের সকলের এক সঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সঙ্গত নয়, উহাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে অনুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে, যাহাতে তারা সতর্ক হয়।" (৯ :১১২)*

সুতরাং কুরআনই উপদেশ দিচ্ছে অনুবাদের এবং তা যার যার ভাষায় প্রচারের।

তবে উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর সাথে আরেকটি আয়াত যোগ করলে এই অনুবাদ সম্পর্কে কুরআনের উপদেশ পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ বলেন :

*"আরবি ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।" (৩৯ :২৮)*

এ আয়াতে লক্ষণীয় 'আরবি ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত,'---।"

এই আয়াতটি কুরআনের অন্য সকল আয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থ করলে মনে হতে পারে, যেহেতু একমাত্র আরাবি ভাষায় কুরআন বক্রতামুক্ত, সুতরাং আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কুরআন পাঠ, আবৃত্তি এবং প্রচার না করার জন্য আল্লাহ মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রথমত : এই আয়াতটির এই অর্থ গ্রহণ করার সমস্যা হচ্ছে, এতে করে কুরআনের বহু আয়াত অস্বীকার করতে হয়। যেহেতু ঐসব আয়াত যে অর্থ


www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করছে তার সাথে এই অর্থ সাংঘর্ষিক (এখানে আলোচনা পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে বিধায় এই গ্রন্থের 'ভাষা' অনুচ্ছেদে চোখ বুলিয়ে নিলে পাঠকের জন্য এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হতে পারে)।

এই সাংঘর্ষিক অবস্থান সত্ত্বেও এই অর্থ মেনে নেওয়া হলে, যুক্তির কষ্টিপাথরে এটিও স্বীকার করে নিতে হবে যে, কুরআনের আয়াত সুসামঞ্জস্য নয়। কিন্তু এই আয়াতসহ আরো কয়েকটি আয়াতে কুরআন দাবি করছে, কুরআন সুসামঞ্জস্য। প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন সঠিক বলছে.নাকি এই আয়াতের যারা এই অর্থ গ্রহণ করছেন তারা সঠিক?

সকল বিশ্বাসীর একটিই উত্তর হবে, কুরআন সঠিক। ফলে কোন বিশ্বাসীর পক্ষ্যেই এই আয়াতের উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ সমীচীন নয়।

দ্বিতীয়ত : তাহলে এই আয়াত কি অর্থ প্রকাশ করছে? কুরআনের উদ্দেশ্য এব ভাষাসহ এ সম্পর্কিত অন্য আয়াতগুলোর সাথে একত্রে এ আয়াতটি পাঠ করলে এই আয়াতের অর্থ একটিই, অনুবাদ সম্পর্কে যে বিধান ইতোমধ্যেই মানুষ সার্বজনীন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। 'কোন বিষয়ে মতভেদ হলে মতভেদ নিরসনে অনূদিত মূল রচনাই হবে ঐ বিষয়ে মতভেদ দূর করার ভিত্তি।' আরো বহু বিষয়ের সাথে কুরআন মানুষকে কুরআনের আয়াতের অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আরাবি ভাষায় 'সমগ্র কুরআন' সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের একটি আয়াতের সাথে অন্য আয়াত পরস্পর সম্পর্কিত এবং কোন একটি আয়াতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না যা অন্য আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

তৃতীয়ত : অনুবাদ মানুষের কাজ। সুতরাং সেখানে সামান্য হলেও ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ থাকতেই পারে। কুরআন দাবি করছে, এটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ। আরাবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরাবি ভাষায় এ গ্রন্থের বাণীর মধ্যে কোন বক্রতা নেই। কিন্তু অন্য ভাষায় এই 'জ্ঞান' অনুবাদের ক্ষেত্রে মানুষের ভুলে তা ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতে বক্রতা বা অসামাঞ্জস্য দেখা যেতে পারে। সে ভুল কারো ইচ্ছাকৃতও হতে পারে অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। সুতরাং অনুবাদকৃত কোন আয়াতসমূহের মধ্যে কোন অসাঞ্জস্যতা অথবা কোন বিধান, আদেশ-উপদেশ-ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে


www.nagorikpathagar.org

মূল 'আরাবি কুরআন'ই হবে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী গ্রন্থ।

অনুবাদ থেকে 'জ্ঞান' অর্জন এটিই বিশ্ব স্বীকৃত পদ্ধতি। কুরআনই বিশ্বাসীদের এ শিক্ষা দিচ্ছে। আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্রে বহু ভাষাভাষী মানুষ বাস করে। আইন প্রণীত হচ্ছে একটি ভাষায়। কিন্তু সকল ভাষা-ভাষীর মধ্যে সে সম্পর্কিত জ্ঞান সহজে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সে রাষ্ট্রের সংবিধান, আইনসহ বিভিন্ন অনূদিত ডকুমেন্টের অনুবাদ করা হচ্ছে। সাধারণ বিধি হলো, মতভেদ দেখা দিলে সে মতভেদ সমাধানে মূল যে ভাষায় আইন, বিধি, রীতি-নীতি প্রণীত হয়েছিল, সেটিকেই মতভেদ নিরসনের ভিত্তি ধরা হবে। কুরআন সাড়ে ১৪'শ বছর আগেই এই ব্যখ্যাটি দিয়েছে। অনুবাদের আইনগত মর্যদার ক্ষেত্রে মানুষের বর্তমান যে জ্ঞান তা সম্ভবত কুরআনেরই দান- মানুষ সেটি জেনে হোক বা তাদের অজ্ঞাতসারেই হোক সে 'জ্ঞান' মানুষের কল্যাণেই ব্যবহার করছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনুবাদ বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা হচ্ছে, এক ভাষার জ্ঞান অন্যভাষায় যথাযথ নির্ভুলভাবে সঞ্চালন করা। যেহেতু এটি বিজ্ঞান– এটি পরীক্ষিত জ্ঞান, এই জ্ঞানের সঞ্চালন প্রক্রিয়া কতগুলো পরীক্ষিত সূত্র বা পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কাজটি যারা করবেন, তাদের ঐ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আরাবি ভাষা ও ধর্ম পালন বিষয়ে নিজেকে মহাপণ্ডিত মনে করলেও অনুবাদ বিজ্ঞান সম্পর্কে যদি পারদর্শী না হন তবে তিনি কুরআন সম্পর্কে ভিন্ন ভাষা-ভাষী কোন ব্যক্তিকে যে জ্ঞান পৌঁছাতে পারবেন, তার থেকে অনুবাদ বিজ্ঞানে পারদর্শী একজন ব্যক্তি বহুগুণ উন্নত বা শুদ্ধ জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারেন।

পণ্ডিতদের মতে একজন দক্ষ অনুবাদকের যে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন তা হলো : তিনি যে ভাষা থেকে অনুবাদ করছেন, সে ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান, যে ভাষায় অনুবাদ করছেন সে ভাষা সম্পর্কে একই মানের জ্ঞান এবং তৃতীয়ত অনুবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান। এই তিনটি উচ্চমাত্রায় দক্ষতার সাথে প্রয়োগের উপরই একটি গ্রন্থের অনুবাদের মান নির্ভর করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোন এক ব্যক্তি আরাবি ভাষার খুবই উচ্চ পর্যায়ের স্কলার কিন্তু বাংলা ভালো জানেন না, আবার বাংলা ভাষায় পণ্ডিত


www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আরাবিতে দক্ষ নয় আবার এমনও হতে পারে তিনি উভয় ভাষায় পণ্ডিত কিন্তু অনুবাদ কৌশল সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই– এই তিনটি ক্ষেত্রেই তার অনূদিত বাংলা অনুবাদ পাঠে মূল গ্রন্থের জ্ঞান আহরণে পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

যে কোন বিশ্বাসীর জন্য কুরআনের উপদেশ হলো, কুরআনে যে বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট আয়াত আছে সে বিধান বিশ্বাসীর জন্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু যে বিষয়ে স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়নি, সে বিষয়ে সাধারণ বিধান হচ্ছে : একজন বিশ্বাসী বিশুদ্ধচিত্তে যেটি উত্তম মনে করবেন তা গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ বলেন :

*"যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; ------ । --- ।" (৪ :৫৬)*

*"হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহে, তাহার রাসুলে, তিনি যে কিতাব তাহার রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ তাহার ফেরেশতাগণ, তাহার কিতাবসমূহ, তাহার রাসুলগণ এবং আখিরাত প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।" ( ৪ :১৩৬)*

এবং

*"...........। তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।" ( ৩৫ : ৪৩)*

*"....................। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাহার ওপর নির্ভর করি এবং যাহারা নির্ভর করিতে পারে তাহারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।" (১২ :৬৭, ইয়াকুব আঃএর উক্তি)*

এবং

*"আমার বান্দাদের যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (১৭ :৫৩)*

এবং


www.nagorikpathagar.org

*"যাহারা তাগুতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।" ( ৩৯ :১৭, ১৮)*

*"ভালো ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই যাহারা মহাভাগ্যবান।" (৪১ :৩৪, ৩৫)*

অনুবাদ সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনায় তুলনামূলকভাবে কোন পদ্ধতিটি উত্তম– পাঠক নিশ্চয়ই তা অনুধাবণ করবেন।

কুরআন সম্পর্কে বহু অভিযোগ আছে, এ অভিযোগ যেমন অবিশ্বাসীদের আছে, আবার বিশ্বাসীরাও তাদের অজান্তেই কিছু অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন (এ বিষয়ে এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পৃথক আলোচনা করা হয়েছে তবে, 'কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন' পরিচ্ছদে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। কিন্তু বিশ্বাসী- অবিশ্বাসী ভাষাবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিকসহ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, কুরআন ক্লাসিক আরবি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পবিত্র কুরআনের ভাষার যে গতি ও সাচ্ছন্দ্য, ধ্বনী গাম্ভির্য ও ব্যঞ্জনা তা অনুপম। মূল আরাবিতে পবিত্র কুরআনের ভাষার যে গতি ও সাচ্ছন্দ্য, ধ্বনী গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনা অনুবাদের মাধ্যমে সেগুলোর প্রকৃত রূপ প্রকাশ বেশ কঠিন। কুরআনের বার্তাগুলো বিভিন্ন গঠনে প্রকাশিত হয়েছে, যা আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে নিখুঁত লিখিত রচনা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কুরআনের ভাষার উপর ভিত্তি করেই আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

অনুবাদকরা মনে করেন, মূলের ভাবোদ্দীপনা ধরে রাখা না গেলে কোন গ্রন্থের গভীরতা ও মহত্ব সম্পর্কে পাঠকদের কোন ধারণা জন্মে না। মামুলি রচনা-নীতি ও ভাষার দুর্বলতা ও আড়ষ্টতা মূল গ্রন্থের মূল ভাব ও দর্শনের নিগুঢ় তাৎপর্য ও অর্থ অপ্রকাশিত থেকে যায়। কোন ভাষার বাকধারা ও


www.nagorikpathagar.org

প্রবচন সে ভাষার অলংকার। এগুলো সে ভাষার নিজস্ব সম্পদ। আবার প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব বাকভঙ্গি ও বাক্যগঠন-প্রণালী আছে। এক ভাষার বাকধারা, অলংকার ও প্রবচন অন্য ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে না। কুরআনে আরবি ভাষার বাকধারা, অলংকার ও প্রবচনের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়েছে। সে সাথে যথাযথ উপমার কারুকার্য এ রচনার মান বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। আরাবি ভাষার এই বাকধারা, অলংকার ও প্রবচনগুলোর মর্মোদ্ধার অনুদৃত ভাষার বাকরীতি সম্মত, প্রাঞ্জলতা ও ভাষার স্বাভাবিক গতি মূলকে অক্ষুণ্ন রাখা কিছুটা কঠিন, তবে অসম্ভব অবশ্যয়ই নয়।

অনুবাদের সাধারণ কতগুলো পদ্ধতি আছে। যেমন অনেকেই মনে করেন প্রতিটি ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ আছে যা ঐ জাতির কিছু 'নিজস্ব রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির' সাথে সম্পর্কযুক্ত। অনুবাদের ক্ষেত্রে যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষায় অর্থ ও মর্মোদ্ধার 'মতবাদ ও সংস্কার'-এর প্রভাব অর্থের বিকৃতি ঘটাতে পারে।

কিন্তু কুরআন সম্ভবত এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কুরআন যে সংস্কার, রীতি-নীতি এবং মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান অবতীর্ণ করেছে, তা আরবের ঐ অঞ্চলে সেই সময়ের প্রচলিত 'রীতি-নীতি এবং মতবাদ'-এর সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কুরআন দাবি করে এই 'রীতি-নীতি এবং মতবাদ' পূর্ববর্তী বহু জাতির নিকট অবতীর্ণ হলেও আরবের ঐ সম্প্রদায়ের কাছে তা করা হয়নি। কুরআনে বর্ণিত 'রীতি-নীতি এবং মতবাদ' ঐ সম্প্রদায়ের রীতি, নীতি এবং মতবাদের ক্ষেত্রে একবারে নতুন।

আল্লাহ বলেন :

*"এই কিতাব আমি নাযিল করিয়াছি যাহা কল্যাণকর। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও। তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে; পাছে তোমরা বল, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্মন্ধে তো গাফিল ছিলাম;' কিম্বা তোমরা বল, 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তাহাদেরও অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম।' এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত*


www.nagorikpathagar.org

*ও রহমত আসিয়াছে। অতএব যে কেহ আল্লাহর আয়াতকে (নিদর্শনকে) প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেবে তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে ? যাহারা আমার আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় সত্য বিমুখতার জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিবো।" (৬ :১৫৫, ১৫৬, ১৫৭)*

*"কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হইতে, যাহাতে তুমি সতর্ক করিকে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিত...পুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে তাহারা গাফিল।" (৩৬ : ৫, ৬)*

এমনকি এই জ্ঞানের যিনি প্রবর্তক বা প্রচারকারী তিনিও ছিলেন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

আল্লাহ বলেন :

*"তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর পথের নির্দেশ দিলেন। (৯৩ :৮)*

কিভাবে তিনি তাকে পথ নির্দেশ দিলেন :

আল্লাহ বলেন :

*"ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি, আরবি ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার। আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।" (১২ : ২, ৩)*

*"ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকিদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ", (২ :২)*

সুতরাং এই গ্রন্থের ব্যবহৃত 'রীতি-নীতি বা মতবাদ' সম্পর্কিত কোন শব্দের অর্থ কোনভাবেই সে সময়ে আরবে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রচলিত কোন রীতি-নীতি বা মতবাদের সাথে সম্পর্কিত নয়।

অধিকন্তু কুরআনেই দাবি করা হচ্ছে, যে পূর্বে এই রীতি-নীতি এবং মতবাদ মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যতীত কোন কোন সম্প্রদায়কে অবহিত করা হলেও, ঐ সকল সম্প্রদায় সে জ্ঞানের অধিকাংশই গোপন করেছে বা বিকৃত করে ফেলেছে। সুতরাং কুরআনের কোন শব্দের অর্থ অন্য কোন


www.nagorikpathagar.org

সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি বা মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণ নেই। সুতরাং সাধারণ যুক্তি হচ্ছে, যে সম্পূর্ণ নতুন রীতি-নীতি ও আদর্শের কথা বলা হচ্ছে যে গ্রন্থে অবশ্যয়ই সে রীতি-নীতি আদর্শ-এর বিস্তারিত তথ্য, ব্যাখ্যা, উদাহরণ দেওয়া হবে। সেটি হবে সহজ ভাষায় এবং এসব রীতি-নীতির বর্ণনা ও উদাহরণ এমনভাবে দেওয়া হবে যাতে মানুষ তার সাধারণ জ্ঞানে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং  ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

পবিত্র কুরআন বহু আয়াতে, বহুভাবে,স্পষ্টভাবে -কুরআন, যে জ্ঞান, রীতি-নীতি বা মতবাদের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বা সয়ংসম্পূর্ণ এই তথ্যটি এবং বার্তাটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এসব আয়াতের কয়েকটি :

*"ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের  জন্য আয়াতসমূহ (নিদর্শন) বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।" (৬ :১২৬)*

*"অবশ্য আমি তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণজ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ এবং দয়া।" (৭ :৫২) (কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলিবেন)*

*"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে," (৩৯ :২৭)*

*এবং*

*কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (৫৪ : ১৭ একই আয়াতের পুনরাবৃত্তি, ২২, ৩২, ৪০)*

কুরআন দাবি করে কুরআন সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতই পূর্ণাঙ্গ যে এই গ্রন্থে বর্ণিত বিধান, উপদেশ, রীতি-নীতি, আদর্শ এই গ্রন্থেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সহজ ভাষা, সহজ বর্ণনা, সে সময়ের আরবে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার; কোন শব্দ নতুন, অপরিচিত বা প্রচলিত অর্থের বাইরে কোন অর্থ কুরআন আরোপ করলে সেটি বুঝানোর জন্য ব্যাখ্যা পর্যন্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে সুতরাং কুরআন শুধু আরবি ভাষাভাষীদের জন্য সকল অর্থেই সহজ করে দেওয়া হয়নি বরং দক্ষ


www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকারীদের জন্য কুরআন অনুবাদও তুলনামূলক সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণভাবেই যে কোন লেখক যখন কিছু রচনা করেন, তিনি যে ভাষায় রচনা করেন, তার সময়ে ঐ ভাষায় শব্দের যে সাধারণ 'প্রচলিত অর্থ' সে অর্থেই তিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি যদি কোন 'অপরিচিত' শব্দ, 'নতুন' শব্দ বা যে শব্দটি যে অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিবের্তে ভিন্ন কোন অর্থ প্রকাশ করতে চান তবে তিনি যে অর্থে লিখছেন সেই অর্থটি সরাসরি বা লেখার কারুকার্যে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে দেন। শব্দের নিজস্ব কোন অর্থ নেই যতক্ষণ না ঐ শব্দটিকে কোন ভাষায় একটি আরোপিত অর্থ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই আরোপিত অর্থ যখন ঐ ভাষার মানুষের কাছে একটি সার্বজনীন রূপ পায় কেবলমাত্র তখনই ঐ শব্দটি ঐ ভাষার নিজস্ব বার্তাবহনকারী টুলসে পরিণত হয়। এখানেই অনুবাদকারীদের জন্য ভাষার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে : এমনও হতে পারে, একটি শব্দ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উচ্চারণে হয়তো একই আছে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে নতুন নতুন অর্থ আরোপিত হওয়ার ফলে তার মূল অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। সুতরাং ঐ ভাষার পুরাণো কোন গ্রন্থে শব্দটি সেই সময়ের প্রচলিত যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল পরবর্তীতে সেটি আর সে অর্থ বহন করছে না। সুতরাং কোন শব্দের অর্থগ্রহণ ও ভিন্নভাষায় তার প্রতিশব্দ চয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার ভাষান্তরের ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে অনূদিত ভাষায় মূল শব্দটি যে অর্থ বহন করছে ঠিক একই অর্থবোধক কোন শব্দ অনুবাদকৃত ভাষায় নেই। সেক্ষেত্রে বহু বাক্য ব্যয়ে মূল শব্দটি সম্পর্কে গ্রাহককে একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে অথবা যুক্তিসংগত হচ্ছে, মূল শব্দটিই রেখে দেওয়া। বিশেষ করে মূল শব্দটি যদি ইতোমধ্যেই সার্বজনীনভাবে পরিচিতি লাভ করে সেক্ষেত্রে মূল শব্দ জোর করে পরিবর্তন করা একটি অপরাধের পর্যায়েই চলে যেতে পারে। এটি যেমন আরাবি শব্দের ক্ষেত্রে হতে পারে তেমনি ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিভিন্ন ভাষায় অজস্র ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হরহামেশাই করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা না হলে, এগুলো দোষের কিছু নয়। যেহেতু


www.nagorikpathagar.org

এসব শব্দ যে অর্থ বহন করে অধিকাংশ ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক কোন শব্দ নেই। সুতরাং মূল শব্দের বাহিত অর্থ ধরে রাখার জন্যও সেটি কখনো কখনো প্রয়োজন হয়। একইভাবে আরবি ভাষার কোন শব্দ যদি মূল অর্থ ধরে রাখার জন্য কেউ ব্যবহার করেন সেটিও যুক্তিসংগত।

বিশ্বের প্রায় সর্বভাষায় এখন কুরআনের অনুবাদ করা হয়েছে। নিজ নিজ মাতৃভাষায় কোন গ্রন্থ পাঠ বা আবৃত্তি শুনে সাধারণ মানুষ ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান যতোটা আহরণ করতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ভিন্ন ভাষায় সেটি বেশ কঠিন। বাংলা ভাষায়ও কুরআনের বহু অনুবাদ হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত অনুবাদ পদ্ধতি অনুসরণে অনুবাদের সংখ্যা কম হলেও আছে। শুধুমাত্র এই অনুবাদগুলো বিবেচনায় নেওয়া এগুলোর মধ্যে সামান্য ভাষার পার্থক্য এবং কয়েকটি শব্দের ব্যবহারের বিষযটি ব্যতীত বড় ধরনের কোন মতভেদ নেই বললেই চলে । সুতরাং বাংলা ভাষাভাষীদের পবিত্র কুরআনের মর্ম ও শিক্ষা যথাযথভাবে অনুধাবন এবং কুরআনের বিধান, উপদেশ নিজ জীবনে চর্চা করার দ্বার সদা উন্মুক্তই আছে।


www.nagorikpathagar.org

# ২.৪ কুরআন বুঝে পাঠ ও অর্থ গ্রহণ

বহুল প্রচলিত একটি উক্তি হলো, ‘একটি গ্রন্থ কখনো দু’জন পাঠ করে না’। এই উক্তির সরল অর্থ, একটি গ্রন্থ পাঠ করে দু’জন ব্যক্তির জ্ঞান, উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা কখনোই এক হতে পারে না। একই গ্রন্থ পাঠ করে এককে জনের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা বা অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও একটি গ্রন্থ পাঠে দুজন পৃথক ব্যক্তির অর্জনের মধ্যে ‘কমন’ জ্ঞান ও উপলব্ধির অংশই বৃহৎ। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক, কুরআন পাঠ করে দুজন পাঠকের অর্জন বা উপলব্ধি কখনোই এক হতে পারে না। তবে দুজনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য হতে বাধ্য।

গ্রন্থকে বলা হয় জ্ঞানের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র। আধুনিক একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদানের প্রধান বিষয় হচ্ছে ‘শিক্ষার পদ্ধতি শিক্ষাদান’। মূলত শিক্ষকরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখার কৌশলটি শিখিয়ে দেবেন। জ্ঞানের জগতের বাকি কাজটুকু ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের করতে হবে।

কুরআন পাঠের কৌশল সম্পর্কে কুরআন বিস্তারিত বলেছে। এ বিষয়ে লেখক ‘কুরআন ও ইসলাম’ পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উল্লিখিত কৌশল সম্পর্কে কুরআনে যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি :

১. কুরআন নিজে মনোযোগ সহকারে বুঝে যথাযথ পাঠ করা বা কারো আবৃত্তি যথাযথভাবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের মাধ্যমে অনুধাবণ ও জ্ঞান অর্জন।

২. বিশুদ্ধচিত্তে (পূর্ব কোন ধারণায় হৃদয় আচ্ছাদিতকরণ ব্যতিরেকে খোলা মনে) পাঠ বা আবৃত্তি শ্রবণ।

৩. কুরআনের কোন আয়াত বা শব্দের অর্থকরণ বা ব্যাখ্যার প্রশ্নে কোন বিভ্রান্তি কুরআনের মধ্য থেকেই তার উত্তর ও সমাধান। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআন।

৪. কুরআন বারবার পাঠ।

৫. কুরআনের আয়াত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কুরআনে কোন বক্রতা নেই, সুতরাং কুরআনের একটি আয়াতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, যা



www.nagorikpathagar.org

অন্য কোন স্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা অন্য আয়াতকে অস্বীকার করা হয়।

৬. যে অংশটুকু পাঠ করা হচ্ছে, সে অংশটুকুতে যে যতটুকু জ্ঞান আহোরণ করতে পারেন বা যে উপদেশটি পাঠক আত্মস্থ করতে পারেন– সেটি নিজ জীবনে চর্চা বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা একই সঙ্গে আল্লাহর কাছে সরল পথ-প্রদর্শন ও জ্ঞান এবং দয়া প্রার্থনা করা- যেহেতু চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক একমাত্র আল্লাহ। এ সম্পর্কিত বহু আয়াতের মাত্র কয়েকটি :

*"আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা 'সুসামঞ্জস্য' পূর্ণ যাহা 'পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়'। ইহাতে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাঁহাদেরও গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহর 'পথ নির্দেশ', তিনি 'উহা' (কিতাব) দ্বারা 'যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন' করেন। 'আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই'।" (৩৯ঃ২৩)*

*"তবে কি তাহারা কুরআন সম্পর্কে 'অনুধাবন' করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা ইহাতে অনেক 'অসংগতি' পাইত।" (৪ঃ৮২)*

*"যখন উহারা সমাগত হইবে (কিয়ামতের দিনে) তখন আল্লাহ উহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শন) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, অথচ তোমরা উহা 'জ্ঞানয়াত্ব করিতে পার নাই'? বরং তোমরা আরো কিছু করিতেছিলে?" (২৭ঃ৮৪)*

*"-----এবং তোমরা তাহাদের মতো হইও না যাহারা বলে 'শ্রবণ' করিলাম বস্তুত তাহারা 'শ্রবণ' করে না। 'আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বোঝে না'।------- (৮ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩)*

*"----- । তাহারা যদি বলিত 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' এবং 'শ্রবণ কর ও আমাদের দিকে লক্ষ্য কর', তবে উহাদের জন্য ভালো হইত। -------- । ( ৪ঃ ৪৬)*

*"-- উহারা আরো বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম', তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।" (৬৭ঃ১০)*


www.nagorikpathagar.org

"যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা 'যথাযথভাবে' ইহা তিলওয়াত করে, তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে; আর যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (২ঃ১২১)

"তুমি কি দেখনা তাহাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে। তুমি কি মনে কর উহাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে, উহারা তো পশুর মতোই বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট।" ( ২৫ঃ ৪৩, ৪৪)

"যাহারা তাগুতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে যাহারা 'মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম' তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই 'বোধশক্তি সম্পন্ন'।" ( ৩৯ঃ ১৭, ১৮)

"--------। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।" (৪২ঃ ২৪)

"আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।" (২০ঃ ১১৪)

"বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এইগুলো ফিরাইয়া দেবে? দেখ আমি কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়।" (৬ঃ ৪৬)

"যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাহাদেরকে তিনি অবশ্যই তাহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাহার দিকে পরিচালিত করিবেন।" (৪ঃ১৭৫)

(বল), "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ (কুরআন) অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে; আর কেহ না দেখিলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নই"। (৬ঃ১০৪)


www.nagorikpathagar.org

*"এবং সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফিরদের নিকট, যাহাদের চক্ষু ছিল অন্ধ (পাঠ না করা) এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।" ( ১৮ঃ ১০০, ১০১)*

*"যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর স্মরণ লইবে।" (১৬ঃ৯৮)*

*"সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (২ঃ ২০৯)*

একটি গ্রন্থের গুরুত্ব নির্ভর করে সে গ্রন্থ থেকে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ বা মনন জগতে তার উপযোগিতার ওপর। কোন গ্রন্থ যখন কখনো-সখনো কতগুলো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত জ্ঞান আহরণে কোন উপযোগিতা নেই তখন সে গ্রন্থ টেনে বেড়ানো এক ধরনের মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পবিত্র কুরআন-এর পূর্ববর্তী গ্রন্থ যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এই মূর্খতার জন্য কুরআনে তাদেরকে কিভাবে তিরস্কার করা হচ্ছে সে বিষয়টি দেখে নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে :

আল্লাহ বলেন :

*"যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই। তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহণকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (৬২ : ৫)*

আয়াতটি শুধুমাত্র তাওরাত বহনকারীদের জন্যই কি? নিশ্চয়ই যারা 'কুরআনের জ্ঞান' গ্রহণ ও সে জ্ঞান নিজ জীবনে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র 'কুরআন নামে একটি গ্রন্থের কাগজের বোঝা' বছরের পর বছর, আমৃত্যু বহন করছেন, তারা আল্লাহর দেওয়া উপমার মতো পুস্তক বহনকারী গর্দভ ছাড়া আর কী হতে পারেন! এই কর্মটির মাধ্যমে তারা প্রকারন্তরে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকারও করছেন। কুরআন যে 'জ্ঞান' এবং মানবজাতিকে বা বিশ্বাসীদের- এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু 'যথাযথভাবে পাঠ' ও 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ', 'নিবিষ্ট চিত্তে' বা 'অভিনিবেশ সহকারে' পাঠ ও শ্রবণ করার এবং এ সম্পর্কে 'চিন্তা, অনুধাবন, উপলব্ধি ও হৃদয়াঙ্গম' করার যে সকল উপদেশ


www.nagorikpathagar.org

কুরআনে দেওয়া হয়েছে, সে উপদেশ যে জ্ঞান অর্জনের তাগাদা ব্যতীত আর কিছু নয়– সে বিষয়ে এই আয়াতের 'স্পষ্ট দৃষ্টান্তের' চেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্য আর কি হতে পারে?

আল্লাহ আরো বলেন :

*"যাহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাহারা বধির, মুক, অন্ধকারে রহিয়াছে। যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।" (৬ঃ ৩৯)*

কুরআনই ব্যাখ্যা দিচ্ছে, কুরআন পাঠ বা শ্রবণ করার একমাত্র লক্ষ্য হলো, কুরআনের জ্ঞান অর্জন এবং কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করতে এবং এর উপদেশসমূহ ব্যবহারিক জীবনে চর্চা করতে হলে এই গ্রন্থের আয়াতসমূহ এ সম্পর্কে 'চিন্তা, অনুধাবন, উপলব্ধি ও হৃদয়াঙ্গম করতে হবে। উল্লেখিত অর্জনের জন্য কুরআন 'যথাযথভাবে, মনোযোগ সহকারে, নিবিষ্ট চিত্তে' বা 'অভিনিবেশ সহকারে' পাঠ ও শ্রবণ করার উপদেশ পালন কুরআন 'বুঝে পাঠ ও বুঝার জন্য শ্রবণ' করা ছাড়া আর কি বিকল্প হতে পারে?

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সাথে নিচের আয়াতটি যোগ করলে বুঝে কুরআন পাঠ করা সংক্রান্ত কুরআনের উপদেশ আরো স্পষ্ট হয়।

আল্লাহ বলেন :

*"কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) 'স্মরণ' করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে 'মুখ ফিরাইয়া নেয়' এবং তাহার 'কৃতকর্মসমূহ' ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি নিশ্চয়ই উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা ইহা (কুরআন) বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কর্ণে বধিরতা আটিয়া দিয়াছি। তুমি উহাদের সৎপথে আহবান করিলেও উহারা সৎ পথে আসিবে না।" (১৮ঃ ৫৭)*

উপরোক্ত আয়াতে 'স্মরণ করাইয়া দেওয়া', 'মুখ ফিরাইয়া নেয়' এবং 'কৃতকর্মসমূহ' শব্দগুলো 'বুঝে' কুরআন পাঠের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কেউ যদি না বোঝে তবে তার পক্ষে কোন বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত কাউকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, অথবা যাকে বলা হচ্ছে সে যদি না বোঝে তবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তার করণীয় সম্পর্কে জানা– কোনটিই সম্ভব নয়।


www.nagorikpathagar.org

সুতরাং 'বোঝার' সাথে কুরআন পাঠ ও আবৃত্তি বা পাঠ করিয়া শোনান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আল্লাহ বলেন তিনি কুরআন 'সহজ' করে দিয়েছেন। আল্লাহ এই 'সহজ' শব্দটি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করেননি। 'উপদেশ গ্রহণকারী সকলের জন্যই সহজ। তিনি যে ভাষাভাষী, সংস্কৃতির বা বর্ণের হোন না কেন– সকলের জন্যই সর্বতভাবেই সহজ হওয়াই যুক্তিসংগত। আরবি ভাষীদের জন্য কুরআন খুবই সহজ। কুরআন তাদের মাতৃভাষায় এবং এতই সহজ যে তারা এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এই ভাষার ব্যকারণ লিপিবদ্ধ করেছে। অনুবাদকারীদের জন্য কুরআন অনুবাদ সহজ এবং অনুবাদ পাঠকারীদের জন্যও কুরআন পাঠে অর্থ উপলব্ধিও সহজ হওয়ারই কথা। বিশেষ করে অনুবাদটি যদি হয় কুরআনের নিজস্ব ব্যখ্যার অনুসরণে এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে।

তবে অনুবাদকারী যদি ইসলাম সম্পর্কে তার নিজস্ব পূর্ব ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে অনুবাদ করেন সে অনুবাদ পাঠ নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। বিশেষ করে সিয়াহ-সিত্তাহসহ অন্যান্য কথ্য নানা বর্ণনা, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির জ্ঞান তার অনুবাদের অনুসঙ্গী করেন, সে অনুবাদ একজন প্রকৃত উপদেশ গ্রহীতার জন্য বিভ্রান্তিই বাড়াবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, কুরআন অনুবাদে এই কাজটিই সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটেছে। কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদে একটি আয়াত, আয়াতের খণ্ডাংশ এমনকি একটি আয়াত থেকে একটি শব্দ বিচ্ছিন্ন করে তার অর্থ প্রকাশে বিভিন্নজনের কথ্য নানা বর্ণনা, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বিশাল বর্ণনা কুরআনের অনুবাদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ঐসব অনুবাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, কুরআনের ঐ একটি আয়াত, আয়াতের খণ্ডাংশ বা আয়াত থেকে নেওয়া একটি শব্দের অর্থ বুঝাতে বা ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে অনুবাদকারী বা তাফসিরকারী কুরআনের মর্মার্থ বা শতাধিক আয়াতকে অস্বীকার বা অর্থের বিকৃতি সাধন করে ফেলেছেন। এ ব্যখ্যাগুলো এতই পরস্পরবিরোধী যে কোন একটি আয়াতের ক্ষেত্রে এই ব্যখ্যার অর্থ গ্রহণ করলে কুরআনের আয়াতের একটির সাথে আরেকটির সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব। কুরআনের আয়াতের এইভাবে ইতিহাস, হাদিস এবং ঐতিহ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার


www.nagorikpathagar.org

বিষয়টিতে কুরআনের প্রতিটি অনুবাদকারীর আসক্তি এতই প্রবল যে যারা কুরআনের বিজ্ঞনসম্মতভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, সে অনুবাদকারীও কখনো কখনো এ লোভ সম্ভবত সামলাতে না পেরে দু-একটি ক্ষেত্রে খুব সীমিত আকারে হলেও ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে সেই একই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন।

এ উপলব্ধির সত্যতা যাচাইয়ে বিভিন্ন তাফসির বা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদকের অনূদিত কুরআনের এক এক করে উদাহরণ প্রদান করতে হলে– অনন্তকাল ধরে সে উদাহরণ শেষ হবে না। তবে বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করিম' থেকে একটি টিকা এখানে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

কুরআনুল করিম অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষাবিদ, অনুবাদক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্কলারদের একটি দল। বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনূদিত যে কোন বিচারে এই অনুবাদ বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ কর্ম। ক্লাসিক বাংলা ভাষার ব্যবহার, সাহিত্য মান এবং কুরআনের মূলের কাছাকাছি অর্থবোধক– এর চেয়ে ভালো অনুবাদ অসম্ভবই বলা যায়। (এই অনুবাদে প্রায় সকল টিকা ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র কোন শব্দের মূল, মূলের আক্ষরিক অর্থ এবং ঐ শব্দের বিভিন্ন রূপে ব্যবহার ও তার অর্থসমূহ।) তবে সামান্য দু-একটি ক্ষেত্রে কয়েকটি বাক্যে কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেগুলো নিশ্চিতভাবেই হাদিস, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকেই এবং এই কাজটি করতে যেয়ে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার কয়েকটির একটি হচ্ছে এই কুরআনুল করিমের ১৯ :৯৬- আয়াতের ১০১৬ টিকা।

আয়াতটি হচ্ছে :

*"যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালোবাসা।" (১৯ :৯৬)*

খুব সম্ভবত এই আয়াতটি এই ভালোবাসা সৃষ্টির বিষয়টি কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে যেহেতু সুরা মরিয়মের এই আয়াতের পূর্ববর্তী ৮৪ আয়াত থেকে ৯৫ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতের টিকায় বলা হয়েছে : তাহাদের (যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে) অন্তরে আল্লাহ ভালোবাসা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহও তাহাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসিলে আসমান ও জমিনে উহার


www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন সৃষ্টির সকলে তাহাকে ভালোবাসিতে থাকে (কুরআনুল করিম-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, টিকা : ১০১৬)

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 'আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসিলে আসমান ও জমিনে উহার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন সৃষ্টির সকলে তাহাকে ভালোবাসিতে থাকেন' -এই অংশটুকু কুরআনে কোথাও বলা হয়নি । আল্লাহ যা জানাননি সে অদৃশ্যের খবরটি অনুবাদকারী জানলেন কিভাবে? অনুবাদে ও টিকায় এ ব্যাখ্যা দেওয়া না হলেও অনুমান করা যায় হাদিস অথবা কোন সূত্র থেকে এ অংশটি টিকা হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কাজটি করতে যেয়ে রাসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধে কাফিরদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, হত্যা প্রচেষ্টা এবং মক্কা থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি সম্পর্কিত কুরআনের বহু শতাধিক আয়াতকে অস্বীকার করা অথবা রাসুল (সঃ) -কে আল্লাহ ভালোবাসতেন না– এ দুটির যে কোন একটি যুক্তি মেনে নিতে হয়।

এই টিকা যদি সঠিক হয় তবে রাসুল (সঃ)-কে আল্লাহ ভালোবাসলে নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনে তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাহলে জগতের অংশ হিসেবে কাফির ও মুনাফিক সকলেই রাসুলকে ভালোবাসেন। সুতরাং কুরআনে রাসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে যেসব আয়াত আছে সেগুলো সত্যি হতে পারে না। অথবা আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসেন না সুতরাং আসমান ও জমিনে সে ঘোষণা দেওয়া হয়নি। সুতরাং রাসুল (সঃ) কাফির ও মুনাফিকরা রাসুলকে ভালোবাসতেন না এবং বর্তমানে যারা রাসুল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে যে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন সে কারণেই তা করছে।

কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এ দুটো উক্তির কোনটিই কুরআন অনুয়ায়ী সঠিক নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই আয়াতের যে টিকা দেওয়া হয়েছে– সেটিই অসত্য। একইভাবে যখনই কুরআনের বাইরে থেকে কোন তথ্য দিয়ে কুরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিণতি হয়েছে প্রায় একই। বিশেষ করে প্রতিটি 'তাফসির' কুরআন ও রাসুলের বিরুদ্ধে এই ধরনের শত শত ভয়ংকর দোষে দুষ্ট।

পবিত্র কুআরনে সর্বনামের ব্যবহার প্রচুর। 'তুমি, আমি, সে, তারা, তাদের, এরা এদের, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো-ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে


www.nagorikpathagar.org

একই আয়াতে অথবা যে আয়াতে এই সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্ব বা পরবর্তী আয়াত বা আয়াতসমূহ মনোযোগ সহকারে বুঝে পাঠ করে এই সর্বনাম ব্যবহারে কাকে, কাদের বা কি বুঝাচ্ছে– সে ব্যাখ্যা সহজেই পাওয়া যায়। কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ ধরনের কোন সর্বনাম অথবা কোন আয়াত পাঠে যদি কোন পাঠকের মধ্যে অর্থ গ্রহণে দ্ব্যর্থ বোধক ধারণা জন্মায় বা তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে দোদুল্যমান থাকেন অথবা তিনি যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভুল অর্থও গ্রহণ করেন তবে তিনি যদি বিশুদ্ধ মনে কুরআন পাঠ অব্যাহত রাখলে তিনি কোন না কোন পর্যায়ে অন্য আয়াতের মাধ্যমে তার ঐ দ্ব্যর্থবোধক ধারণা, দোদুল্যমনতা বা তাৎক্ষণিকভাবে যে ভুল করেছিলেন নতুন উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি পূর্বাহ্নে গৃহীত অর্থ বা ধারণা সংশোধনে বাধ্য হবেন। তিনি যদি নিজের উপলব্ধির পর সে কাজটি না করেন, তবে পরবর্তীতে তিনি যতই পাঠ অব্যাহত রাখবেন বা দ্বিতীয়তবার প্রথম থেকে পাঠ শুরু করেন তার নিজেরই মনে হবে যে তিনি যেন কুরআন সম্পর্কে আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে পাঠক, তিনি বিশ্বাসীই হন বা অবিশ্বাসীই হন, যদি ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে পূর্বধারণা নিয়ে কুরআন পাঠ করে বসেন এবং তিনি কুরআন পাঠে কিছুদূর এগুনোর পর নতুন কোন উপলব্ধি হয় এবং তিনি সৎ মানসিকতায় সে উপলব্ধি ধারণ না করে তার নিজ পূর্বধারণাতেই অটল থাকেন তবে তিনি পাঠে যতই অগ্রসর হবেন ততই তার মনে হতে থাকবে কুরআনের আয়াতগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পর বিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। উদাহরণটি ঠিক যথার্থ না হলেও অনেকটা এমন, এ যেন পাটিগণিতের সরল অংকের মতো, একবার একটি ভুল করলে যতই এগুতে থাকবে ততই তা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে এবং একসময় সে অংক কোন ফল দেবে না– তা হবে পরিত্যাজ্য। এক্ষত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ বলেন :

*"যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে 'উহাদের' বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব তখন কি অবস্থা হইবে? যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং রাসুলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে, যদি তাহারা মাটির সংগে মিশিয়া যাইত। ------।" (৪ঃ ৪১, ৪২)*


www.nagorikpathagar.org

*"সেই দিন আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের বিষয়ে একজন সাক্ষী এবং তোমাকে (মোহাম্মাদ সঃ-কে) আমি সাক্ষীরূপে 'ইহাদের' বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদরূপে তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।" (১৬ঃ৮৯)*

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে 'উহাদের এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'ইহাদের' সর্বনাম দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা যায়। অনেকে তাফসিরকারক অনুবাদককারী সে কাজটি করেছেনও।

প্রথমত : প্রথম আয়াতে 'উহাদের' সর্বনামটি প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী তাদের নিজ নিজ নবী-রাসুল অর্থ গ্রহণ করে মুহাম্মাদ (সঃ) এই সকল নবীর জন্য সাক্ষী অর্থ গ্রহণ। দ্বিতীয় আয়াতেও 'ইহাদের' সর্বনাম দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের সাক্ষীর সাক্ষী মুহাম্মাদ (সঃ) অর্থ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করে যদি কুরআন পাঠে অগ্রসর হতে হয় তবে যখন নিমোক্ত আয়াত কটি পাঠ করা হবে করা হবে তখন উল্লেখিত অর্থ সাংঘর্ষিক বা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ বলেন :

*"----। ----। যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম তত দিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক ও সাক্ষী।" (৫ঃ ১১৭ -ঈসা আঃ-এর উক্তি যখন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন তার অনুসারীরা তাকে যে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মনে করে সে সম্পর্কে)*

*"আমার রাসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদেরকে পাঠাইয়াছিলাম তাহদের ক্ষেত্রেও ছিল একই নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।" (১৭ঃ ৭৭)*

*"-----। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাহার ফেরেশতাগণে, তাহার কিতাবসমূহে এবং তাহার রাসুলগণে "ঈমান আনিয়াছে, (তাহারা বলে) আমরা তাহার রাসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আর (তাহারা বলে) আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। --।" (২ঃ২৮৫)*

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট রাসুলগণ যত দিন যে সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকবেন তত দিন তিনি শুধুমাত্র তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। সেই সাথে রাসুলগণের


www.nagorikpathagar.org

মধ্যে কোন পার্থক্য না করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। ফলে উল্লেখিত আয়াতে 'উহাদের' ও 'ইহাদের' সর্বনাম দুটির অর্থ একটিই তা হলো : মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্প্রদায়। উল্লেখিত (৪ঃ ৪১, ৪২) আয়াতের পূর্বেও আয়াতসমূহও পাঠে দেখা যায়, সেখানে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে আরো বহু আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ধারণ করে এই 'উহাদের' ও 'ইহাদের' সর্বনাম দুটির মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্প্রদায় নির্দেশে যে ব্যবহার হয়েছে সে বিষয়টিও লক্ষণীয়।

অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন আল্লাহ রাসুলগণকে এক অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছেন :

"--------। *আমি তো নবীগণের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদকে আমি যাবুর দিয়াছি। (১৭ : ৫৫)*

"*এই রাসুলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদা উন্নীত করিয়াছেন। মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। -----। (২ঃ২৫৩)*

কিন্তু উপরোক্ত আয়াত পাঠে এই 'মর্যাদা' অর্থ কোনভাবেই একজন রাসুলের সাক্ষী অন্যজন রাসুল– এ অর্থ প্রকাশ করে না বা উল্লেখিত ৫ঃ ১১১, ১৭ঃ ৭৭ ও ২ঃ ২৮৫ বা এই 'নবীদের মধ্যে পার্থক্য' সৃষ্টি না করার উপদেশ সম্বলিত অন্যান্য আরো যে আয়াত আছে সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ঠিক একইভাবে কুরআনের যে কোন আয়াতের বা শব্দের ভুল অর্থ গ্রহণ বা বিভ্রান্তি দেখা দিলে কুরআন পাঠ যদি অব্যাহত রাখা হয় তবে তার সঠিক অর্থ গ্রহণে পাঠক বাধ্য হবেন। অর্থাৎ কুরআন নিজেই তার পাঠকের সংশোধক। একটি ভাষায় একই উচ্চারণে বিভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটা বোঝার সহজ উপায় হলো, বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক এবং বাক্যের মধ্যে সেই শব্দের সাথে অন্যান্য শব্দের সম্পর্ক এবং ব্যবহৃত শব্দটির কোন অর্থে বাক্যটি অর্থবোধক– সেটি বিবেচনা করা।

খুব সাধারণ উদাহরণ হতে পারে বাংলায় 'হাল' শব্দটি। এ শব্দটির দুটি পৃথক


www.nagorikpathagar.org

অর্থেও একটি : হাল অর্থ অবস্থা এবং 'হাল' নৌকার নিয়ন্ত্রণের কাঠিটি। কিন্তু যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা সহজেই ব্যবহৃত বাক্যে এই শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝে নেন। এর জন্য লেখক বা বক্তাকে কোন ব্যখ্যা দিতে হয় না। প্রতিটি ভাষায়ই এমন বহু শব্দ আছে এবং আরবিও তার ব্যতিক্রম নয়।

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত শব্দার্থ গ্রহণে উপরোক্ত বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে আরবে যে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো সেই অর্থই গ্রহণ না করা হলে অর্থেও বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। প্রতিটি ভাষায় বহু শব্দ আছে যা হয়তো অতীতে এক অর্থে ব্যবহৃত হতো; কিন্তু সময়ের সাথে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমনকি পূর্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হতো শত বর্ষ পরে হয়তো সেই একই ভাষায় সে শব্দটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন কোন রচনাতে সেই শব্দের অর্থ বুঝতে চাইব, তখন অবশ্যই যে সময়ের ঐ রচনাটি ঠিক সেই সময়ে ঐ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো সেই অর্থটিই বেছে নেব এবং সে অর্থটি গ্রহণ করলেই ঐ রচনায় কোন বাক্যের প্রকৃত মূল অর্থ উদ্ধার সম্ভব। কোন অবস্থাতেই সেটি পরবর্তীতে কি অর্থ প্রকাশ করছে বা কোন স্কলার কি অর্থ আরোপ করেছেন– সে অর্থে গ্রহণ করা হলে লেখকের মূল বক্তব্য বিকৃত হতে বাধ্য বা সে বক্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্য বা কোন শব্দের মূল অর্থ প্রাপ্তিতেও যে কোন পাঠকের জন্য কুরআনের ওপরই নির্ভর করাই অধিক যুক্তিসংগত।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে ব্যবহৃত বহু শব্দের অর্থ উদ্ধার প্রসঙ্গে ইদানীং খুবই প্রচলিত উক্তি 'ইসলামিক পরিভাষা'। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই পরিভাষার আবিষ্কারক বা ব্যবহারকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিয়াহ্ সিত্তায় ব্যবহৃত হাদিস, ইতিহাস, প্রচলিত মিথ এবং তাদের নিজস্ব মতবাদ ও সংস্কারের প্রভাবে প্রভান্বিত হয়ে ঐ সব শব্দের ওপর নতুন নতুন অর্থ আরোপ করে কুরআনের আয়াতের মূল বক্তব্যে বিভ্রান্তিই বাড়ানোর অপচেষ্টা করেছেন।

কুরআনে মুহাম্মাদ (সঃ)এর সমসাময়িক প্রচলিত আরাবি ভাষায় ব্যবহার নেই এমন নতুন কিছু শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব শব্দগুলোর অর্থ কি সেটিও কুরআনে ব্যাখ্যাসহ্ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে কুরআনের মূল


www.nagorikpathagar.org

সুর, একই বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে ও পূর্বাপর বাক্যের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যতা- ইত্যাদি বিবেচনায় কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত।

কুরআনে একই বিষয়ে বা একই ঘটনা বা ঐ ঘটনার ভাবে গভীরভাবে সম্পর্কিত ঘটনা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ বহুক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কেন তা করা হয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কুরআন পাঠে এ প্রশ্নের বেশ কয়েকটি উত্তর পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন :

*"আমি এইভাবে 'আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি'। ফলে উহারা বলে, 'তুমি পড়িয়া লইয়াছ' ? কিন্তু আমি তো স্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। (৬ :১০৫)*

*"আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে 'বহু বিষয় বারবার বিবৃত করিয়াছি' যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (১৭ :৪১)*

*"আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাহাতে তুমি 'ইহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে' এবং আমি আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।" (১৭:১০৬)*

*"কাফিররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবার অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি 'তোমার হৃদয়কে ইহা দ্বারা মজবুত করিবার জন্য' এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি। (২৫ :৩২)*

সম্ভবত এই কারণেই আল্লাহ বলেন :

*"আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস্য এবং 'যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়'।-------। -----।" (৩৯:২৩)*

আল্লাহ পুনঃপুনঃ কুরআন পাঠের উপদেশ দিয়েছেন। যারা বারবার আদ্যোপান্ত বা কাভার-টু-কাভার কুরআন পাঠ করবেন, মনোযোগী পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন একই বিষয় বা একই ঘটনা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্র করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে একটি 'পরিস্থিতির চিত্রায়ন বা ব্যাখ্যা প্রাপ্তি' খুব সহজ।


www.nagorikpathagar.org

কুরআন আদ্য-প্রান্ত বেশ কয়েকবার পাঠ করলে কুরআনে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সুরায় ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকলেও পরস্পর সম্পর্কিত আয়াতগুলো খুব সহজেই একজন পাঠকের মনের ভেতর পাশাপাশি গেঁথে যায়। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি কুরআনের কোন আয়াত কোথাও উল্লেখ করেন বা ইসলাম সম্পর্কে কোন উক্তি করেন তবে পুনঃপুনঃ যারা বুঝে কুরআনের আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেন তাদের মনে ঐ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ কুরআনের যেখানেই অবস্থান করুক না খুব সহজভাবেই মনের ভেতর একত্রিত হয়ে যায়– এর মাধ্যমে তিনি বক্তার ইসলাম সম্পর্কিত উক্তির সত্যাসত্য ও যথার্থতা নিজেই খুব সহজেই যাচাই করে নিতে পারেন।

সুতরাং কুরআনের কোন একটি মাত্র শব্দের 'অর্থ' উদ্ধার করতে হলেও পাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন সে শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা কুরআনই তাকে দেবে। বারবার আদ্যপ্রান্ত কুরআন পাঠ করেই সে শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে হবে। কুরআন পাঠ করে কোন ব্যক্তি কোন আয়াত তো নয়ই, যদি মাত্র একটি শব্দের ভুল অর্থ গ্রহণ করেনও তবে তিনি যদি কুরআন বারবার আদ্যোপান্ত খোলামনে আন্তরিকভাবে পাঠ করেন তবে তার ভুল শুধরানোর বহু সুযোগ তাকে কুরআনই করে দেবে। কিন্তু যদি তিনি সেটি শুধরানোর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তার কোন পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে সে ধারণায় দৃঢ় থাকেন, তবে তিনি কুরআনের বহু আয়াতকে অস্বীকারের ঝুঁকিতে পড়তে বাধ্য। এখানেই কুরআনের মহত্ব ও অনন্যান্যতা।

সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের কোন আয়াত পাঠে বা উল্লেখের মাধ্যমে ঐ আয়াতের স্পষ্ট অর্থকরণ বা অর্থ প্রকাশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং কোন স্পষ্ট অর্থগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম নির্ভরযোগ্য। এই অবস্থায় ঐ বিচ্ছিন্ন আয়াতের পূর্বাপর আরো কয়েকটি আয়াত দেখে নিলে সেটি আরেকটু স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, একইভাবে কোন আয়াত আরো অধিক স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ বা কোন আয়াতের ব্যাখা আরো স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় যখন সংশ্লিষ্ট রুকুর সবগুলো আয়াত পাঠ করা হয়, এই অর্থ আরো পূর্ণাঙ্গ বুঝতে হলে ঐ সুরার সবগুলো আয়াত পাঠ বাঞ্ছনীয়। তবে কোন আয়াতের সত্যিকার স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ পেতে কুরআনের কাভার-টু-কাভার বারবার পাঠই একমাত্র উপায়। এভাবে যত বেশিবার আদ্যোপান্ত কুরআন


www.nagorikpathagar.org

পড়া হতে থাকবে, পাঠকের কাছে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা ততই স্পষ্ট হতে থাকবে। এই ক্ষেত্রে কুরআনের বাইরে থেকে কারো কোন বাণী, বক্তব্য, কারো বর্ণিত কোন ঘটনাবলী ব্যবহার করে কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ গ্রহণ বা ব্যাখ্যা প্রদান কুরআনের সে আয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তিই বাড়াতে পারে মাত্র।

সাধারণভাবে একটি সত্য উক্তির সাথে বহু সত্য উক্তি অনুগামী হতে পারে। কুরআনের আয়াতের পূর্ণ অর্থ গ্রহণের জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারো কোন একটি সত্য উক্তি বা সত্য কোন ঘটনার বর্ণনার সাথে আরো বেশ কিছু সত্য অনুগামী হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক 'ক' বলল : 'খ'-এর মাথার চুল কালো।

এই উক্তি যদি বাস্তবেই সত্য হয়, তবে 'খ'-এর চুল কালো– এ সত্যের সাথে আরো যে সত্য অনুগামী হয়েছে, তা হলো :

১. 'ক' বোবা নয়, সে কথা বলতে পারে।
২. 'ক' নিশ্চয় চেখে দেখে অর্থাৎ সে অন্ধ নয়।
৩. 'ক' কালার ব্লাইন্ড নয়।
৪. 'খ' এর অবশ্যই মাথা আছে
৫. 'খ'-এর মাথায় অবশ্যই চুল আছে– অথ্যাৎ সে ন্যাড়া নয়।

সুতরাং 'ক' এর উল্লেখিত একটি উক্তির মাধ্যমে আমরা শুধু 'খ এর চুল কালো' একটি সিদ্ধান্ততেই পৌঁছাচ্ছি না বরং এই উক্তির মাধ্যমে আমরা আরো অন্তত : ৫টি সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। এটি খুবই স্পষ্ট যে, এখানে একটি সত্যের সাথে বহু সত্য অনুগামী হচ্ছে।

'ক'-এর উল্লেখিত একটি মাত্র সত্য উক্তি থেকে যে ৫টি সত্য পাওয়া যায়- এটি 'ক' এর উক্তির ব্যখ্যা নয়, এটিকে বলা যেতে পারে, 'ক'-এর উক্তির অন্তর্নিহিত আরো কিছু সত্য উপলব্ধি। এবং সেগুলো 'ক'-এর উক্তির মধ্যেই রয়েছে। মূলত : 'ক' এর উক্তির অর্থ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করাই এ সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞানলাভ।

এখন যদি 'গ' দাবি করে, 'ক' কথা বলতে পারে না, সে ছিল বোবা; এ দাবির প্রেক্ষিতে বাস্তবতা হচ্ছে, 'ক'-এর উক্তি সত্য হলে 'গ'-এর উক্তি অবশ্যয়ই অসত্য।


www.nagorikpathagar.org

তবে উপরোক্ত বর্ণনায় সত্যতার প্রশ্নে একটি বিষয় হতে পারে। একইভাবে উল্লেখিত উক্তি সত্য হওয়া সত্ত্বেও সহযোগী কোন উক্তি উক্ত সত্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে, যার ফলে 'ক'-এর উক্তি সত্য হওয়া সত্ত্বেও মূল অর্থের অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

যেমন : 'ঘ' বলল : 'খ'-এর মাথার চুল সাদা, সে চুল রঙ করে কালো করেছে। এই সহযোগী উক্তি যদি সত্য হয় তবে উল্লখিত পাঁচটি সত্যের সঙ্গে আরো যে যে সত্য যুক্ত হয় তার মধ্যে আছে :

১. 'খ'-এর চুল কালো দেখালেও বাস্তবে কাল নয়।

২. সে তার চুলে রঙ করায়

৩. 'ক' 'খ' সম্পর্কে তত বেশি জানে না যতো বেশি 'ঘ' জানে।

দেখা যাচ্ছে, 'ক' এর উক্তি সত্য হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা ভিন্নরূপ। এমন বহু উক্তি 'ক'-এর প্রথম উক্তিটি 'সত্য' হওয়া সত্ত্বেও সে সত্যে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রেও একটি আয়াত পাঠে একটি মূল উপদেশ-আদেশ, তথ্য বা সত্যের সাথে বেশ কয়েকটি উপদেশ-আদেশ, তথ্য বা সত্য অনুগামী হয়। এই বিষয়টি কুরআনের ব্যাখ্যা পেতে বা অর্থ উদ্ধারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন আয়াত পাঠে সেখানে প্রধান উপদেশের সাথে আর কি কি উপদেশ-আদেশ, বিধি-বিধান বা তথ্য অনুগামী হয়েছে তা অনুধাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐ সব উপদেশ-আদেশ, তথ্য বা সত্য মাথায় রেখে ঐ আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত সেই একই বিষয়ে অপর আয়াতসমূহ সহযোগী বা সম্পর্কযুক্ত করে বিবেচনা করলে প্রাপ্ত উপদেশ-আদেশ, তথ্য বা সত্যে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে।

আল্লাহ যখন বলেন, মানুষ তার নিজ কর্মের দায়ভার বহন করবে, এ সত্যের সহগামী সত্য হচ্ছে, মানুষ এই পৃথিবীতে কিছু বিধানের অধীনে তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন। ঠিক, একইভাবে আল্লাহ যখন মানুষকে উপদেশ দেন, হে মানুষ তোমার প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ কর, এই উপদেশের সহগামী সত্য হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে আত্মসমর্পণ করা না করার ক্ষেত্রেও 'ইচ্ছের স্বাধীনতা' দিয়েছেন। আত্মসমর্পণকারী শব্দটির বিপরীত শব্দ বিদ্রোহী, কারো অধীন নয়, মুক্ত বা স্বেচ্ছাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না


www.nagorikpathagar.org

করলে আল্লাহ নিজ থেকে কাউকে আত্মসমর্পণ বা কর্মে বাধ্য করেন না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ ঘোষণা করেন, তিনি ন্যায়বিচারক এবং কারো প্রতি জুলুম করেন না। সুতরাং এই উক্তির মাধ্যমে 'আল্লাহর ইচ্ছা' সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সকল মানুষের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য যে 'সাধারণ বিধান' তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ উক্তি সত্য হলে আরেকটি সত্য হচ্ছে, আল্লাহ ঘোষিত সে সাধারণ বিধান প্রযোজ্য না হলে, তিনি কারো কর্মে হস্তক্ষেপও করেন না। এ ধরনের বহু সত্য কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সমর্থিত আছে ।

কুরআন পাঠের আরেকটি দিক হচ্ছে ইসলামিক পরিভাষার নামে কুরআনে উল্লেখিত বহু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পরবর্তীতে নতুন অর্থ আরোপ করা হয়েছে। পাঠক এ বিষয়টি খেয়াল না করলে বিভ্রান্ত হতে পারেন। বিশেষ করে তিলওয়াত, কিরাত, কাফির, জিহাদ, মুশরিক, কিতাবী, মুনাফিক, ঈমান, ফরজ, হাদিসসহ আরো বেশ কিছু শব্দ। এসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে পাঠক কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঐ সকল শব্দের মূলের অর্থ গ্রহণ এবং কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে তার বিভিন্নরূপের ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকলে এইবিভ্রান্তি সহজেই এড়ান সম্ভব।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুরআনে 'তিলওয়াত ও কেরাত' দুটি মূল আবৃত্তি ও পাঠ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন তাফসিরকারক, আলেম ইমাম– এ দুটি শব্দের ওপর বিভিন্ন অর্থ আরোপ করেছেন। তবে কুরআনে এই শব্দ দুটির ব্যবহারে পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে কোন পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই শব্দ দুটির কোনটি দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে তার ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। যেমন কুরআনে তিলওয়াত বা এ শব্দটি থেকে উত্থিত বিভিন্ন রূপ যখন কোন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন আয়াতে তার ব্যবহারে স্পষ্ট যে সেটি মানুষকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার যখন কিরাত বা এই শব্দটি থেকে উত্থিত কোন রূপ শব্দ কোন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন আয়াতের অন্যান্য শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে নিজে নিজর জন্য নিজে পাঠ করা। কোন গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কুরআন স্বয়ং এসব শব্দের ব্যবহারের কৌশলের মাধ্যমেই


www.nagorikpathagar.org

শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং কুরআনের বাইরে হাদিস, ইতিহাস বা তৎকালীন আরবের রীতি-নীতির সাহায্যে কারো ব্যাখ্যা করা বা এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন শব্দার্থ আরোপ কেবল বিভ্রান্তিই বাড়াতে পারে।

ঠিক একইভাবে কুরআন অবতীর্ণকালীন কাফির, জিহাদ, মুশরিক, কিতাবী, মুনাফিকসহ কুরআনে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রেই ঐ সময়ে আরবে ব্যবহৃত এসকল শব্দ বা শব্দমূলের অর্থ  মূল অর্থ জেনে কুরআনে তার ব্যবহার কৌশল ও এ সংক্রান্ত কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমেই এইসব শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণই কুরআন বুঝে পড়ার জন্য যুক্তিসংগত।

একটি কথা খুবই প্রচলিত, 'কুরআন পাঠ করে বুঝি না'। অথবা এমনও অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে, কুরআন অনুবাদ বুঝে পাঠ করার পর সে আয়াত সম্পর্কে যখন কোন ইমাম, মাওলানা বা স্কলারের কাছে কোন কারণে উপস্থাপন করা হয়, তিনি হয়তো বলেন, 'আপনি কুরআনের কি বুঝেন, আপনি কি মাওলানা, ইমাম বা কোন ইসলামিক স্কলার। আপনি এসব বুঝবেন না?'

এই দুটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট বলেন, যারা কাফির তিনি তাদের হৃদয় আচ্ছাদিত করে দিয়েছেন, তারা দেখেও দেখে না, তারা তাদের নিজেদের পূর্বধারণার বাইরে কিছুই বুঝতে পারে না, তাদেরকে বধির করা হয়েছে। আরবি মূল কুফরুন থেকে কাফারু বা কাফির। কুফরুন হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা, লুকিয়ে ফেলা, আবৃত করা, চাপা দেওয়া। যে এই কাজ করে সে কাফির। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, নিজস্ব স্বার্থ হাসিলে বা কারো প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে যে সত্য ঢেকে রাখে, কণ্ঠ চেপে ধরে, বাস্তবতা আড়াল করতে চায় সে কাফির। এই কাজগুলো যে অনবরত করে আল্লাহ একসময় সে ব্যক্তিরই চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দেন। সে তখন সকল সত্য, বাস্তবতা গ্রহণ করার ক্ষমতা হারায়, মনকেই চোখ ভাবে, তার নিজের চিন্তার বাইরে ভালো কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা হারায়, অযৌক্তিক বিরোধিতাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও শোভন মনে করে।

এ সম্পর্কে বহু আয়াতের কয়েকটি :


www.nagorikpathagar.org

*"তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহাদেরকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত আয়াত (নিদর্শন) প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে ঈমান আনিবে না;------- ।" (৬ :২৫)*

*"যাহারা কুফরি করে তাহাদের উপমা যেমন কোন এক ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যাহা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না, বধির মূক অন্ধ- সুতরাং তাহারা শুনিবে না।" ( ২ : ১৭১ এবং ১৭০)*

*"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই। আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিযাছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং ইহাদিগকে বধির করিযাছি; তোমার প্রতিপালক এক; ইহা যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ট প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।" (১৭ : ৪, ৪৬)*

*"ইহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর স্থান দেয়, এবং আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। উহারাই তাহারা, আল্লাহ তাহাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল। (১৬ : ১০৭, ১০৮)*

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি বলেন, তিনি নিজে কুরআন পাঠ করে বা কারো পাঠ শুনে কিছু বুঝতে পারছেন না– কুরআনের আয়াত অনুযায়ী তিনি যেন নিজেকেই নিজে কাফির হিসেবে ঘোষণা করছেন। কেউ যদি কুরআন পাঠ করে আদৌ কিছু না বোঝেন তবে তার নিজের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া যুক্তিসংগত যে, আল্লাহ কি কোন কারণে তার অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছেন যেন সে কুরআন উপলব্ধি করতে না পারে, আল্লাহ কি তাকে কুরআন পাঠ শোনার ক্ষেত্রে বধির করে দিয়েছেন যেন পাঠ শুনে তা বুঝতে না পারে?

সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে, যখন কোন ব্যক্তি সে নিজেকে ইসলামের স্কলার, ইমাম, মাওলানা, পীর, মাশায়েখ– যাই দাবি করুন, তিনি যদি কোন ব্যক্তিকে বলেন, 'আপনি কুনআান পাঠে কিছু বুঝবেন না' অথবা 'আপনি কুরআনের কি বোঝেন'– তখন নিশ্চিত যে ঐ স্কলার, ইমাম, মাওলানা, পীর,


www.nagorikpathagar.org

মাশায়েখ ঐ ব্যক্তিকে 'বুঝে কুরআন পাঠে' অনুৎসাহিত করে তাকে কাফির হওয়ার পথে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন অথবা কুরআন পাঠ থেকে বিরত রেখে তাকে কাফির হতে উৎসাহিত করছেন। এ কাজটি কেবল একজন কাফিরের পক্ষেই করা সম্ভব।

কুরআন আর দশটি গ্রন্থের মতো নয়। কুরআনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, একই বিষয়ের আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুকু ও সুরা বা পরিচ্ছদে ছড়িয়ে -ছিটিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে হুবহু একই আয়াত এবং একই বিষয়ে একই অর্থবোধক আয়াত বিভিন্নভাবে বারবার 'আপাত দৃষ্টিতে' বিচ্ছিন্নভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটির মূল কারণ আল্লাহই জানেন। সম্ভবত মানুষের জন্য আরো অনেক পরীক্ষার সাথে এটিও একটি পরীক্ষা। কে কত আন্তরিকভাবে, গুরুত্ব দিয়ে ও ধৈর্য সহকারে কুরআন পাঠ করছেন হয়তো তারই পরীক্ষা! বিচ্ছিন্নভাবে কুরআন পাঠ যে কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে এবং কুরআনের আয়াত শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে চর্চা করে ও প্রচার করে অর্থাৎ তাদেরও পছন্দমতো কিছু আয়াত গ্রহণ করে কিছু বর্জন করে কুরআনের ভাষায় তারা মুনাফিক।

কুরআন কাভার-টু-কাভার বা আদ্যোপান্ত বারবার বুঝে পাঠ না করা হলে, এই আয়াতসমূহের একটির সাথে আরেকটির সংযোগ কঠিন। যে যত বেশি আন্তরিকভাবে কুরআন কাভার-টু-কাভার বারবার পাঠ করবেন, সে তত বেশি এই সংযোগ সাধনে সক্ষম হবেন। সেই সাথে তিনি সম্ভবত এ সত্যও আবিষ্কার করবেন যে, প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও বিচ্ছিন্ন নয়, প্রতিটি আয়াতই একটির সাথে প্রথমে একটি তারপর সে দুটির সাথে আরেকটি– এভাবে ক্রমশঃই সম্পর্কযুক্ত আয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, এটি যেমন প্রথমে বিষয়ভিত্তিকভাবে ঘটতে থাকবে একই সাথে সে সব বিষয়গুলো ধীরে ধীরে গভীর সম্পর্কযুক্ত হয়ে একটি অনন্য সৌন্দর্যে বিকশিত অখণ্ডনীয় শক্তিশালী একক কাঠামোর রূপ দেবে। আল্লাহ যে কাঠামোর নাম দিয়েছেন ইসলাম।


www.nagorikpathagar.org

## ২.৫ লজিক, বিতর্ক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

কুরআন, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) বিরুদ্ধে রটনা ও বিদ্রূপ এবং নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন গত চৌদ্দশত বছর একটি নিয়মিত ঘটনা। বর্তমানেও তা ঘটে চলেছে। তবে একাবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগে আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানী হিসেবে দাবিদার একদল অবিশ্বাসী কুরআনের দর্শন, রাসুল (সঃ) এবং কুরআন সম্পর্কে যেসব প্রসঙ্গ টেনে এনে এই আক্রমণ, বিদ্রূপ অথবা প্রশ্ন উত্থাপন করছেন তার কোনটিই নতুন নয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর গত প্রায় ১৪'শ বছরে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বহু অগ্রসর হয়েছে কিন্তু কুরআন, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ, রটনা ও বিদ্রূপাত্মক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় বা প্রশ্ন উত্থাপন এখনও করা হচ্ছে তার মূল বিষয়বস্তু ও ধরন সেই ৭ম শতাব্দিতে বা তার বহু পূর্বে মনুষ্য জ্ঞানের চর্চার শুরুর পর্ব থেকেই আল্লাহ, নবী-রাসুল এবং আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নেরই যেন চর্বিত চর্বন। আরো লক্ষণীয় হচ্ছে, কুরআন স্বয়ং এই সকল অভিযোগ রটনা, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ও উত্থাপিত প্রশ্ন এবং তার যথাযথ যুক্তিসংগত উত্তর বহন করছে।

কুরআন, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে বা তাঁর পূর্বের আল্লাহর নবী ও রাসুল এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের বিরুদ্ধে রটনা, বিদ্রূপ এবং প্রশ্ন যেমন বহন করছে, তেমনি তার উত্তর কখনো কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে সরাসরি দেওয়া হয়েছে, কখনো বা উপমা-উদাহরণ দিয়ে সেসব প্রশ্ন ও মন্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে। আবার বেশ কিছু মন্তব্য ও প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে এসেছে।

৭ম শতাব্দিতে কুরআন অবতীর্ণকালীন কুরআন, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে কি কি রটনা ও বিদ্রূপাত্মক উক্তি এবং প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে কুরআনের এ সম্পর্কিত বহু আয়াতের মধ্যে কয়েকটি আয়াত :



www.nagorikpathagar.org

**অভিযোগ : পাগল ও উম্মাদ :**

*"উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে, উহাদের নিকট তো আসিয়াছে এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা তা রাসুল; অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল।" (৪৪ঃ ১৩, ১৪)*

*"উহারা বলে, 'ওহে, যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ! ( ১৫ঃ ৬)*

*তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদের সহচর আদৌ উম্মাদ নয়। সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।" (৭ঃ ১৮৪)*

*"----- গোপনে আলোচনাকালে জালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।' দেখ উহারা তোমার কী উপমা দেয়! .......... । "(১৭ঃ ৪৭, ৪৮)*

*"উহাদিগকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই বলা হইলে, উহারা অহংকার করিত এবং বলিত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করিব?" ( ৩৭ঃ ৩৫, ৩৬)*

*"কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে এবং বলে 'এ তো এক পাগল।' (৬৮ঃ ৫১)*

**অভিযোগ কুরআন রাসুল (সঃ)-এর রচনা :**

*"তাহারা কি বলে, সে (মূহাম্মাদ সঃ) ইহা রচনা করিয়াছে? বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সুরা আনয়ণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (১০ঃ৩৮)*

*"তাহারা কি বলে, 'সে ইহা রচনা করিয়াছে ? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে ইহার অনুরূপ ১০ টি স্বরচিত সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া নাও।" (১১ঃ ১৩)*

*"তাহারা কি বলে, 'সে ইহা রচনা করিয়াছে ? বল, 'আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত।" (১১ঃ৩৫)*

*"কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। (উহারা বলে), 'এই কি সেই, যে তোমাদের দেব-*


www.nagorikpathagar.org

*দেবীগুলোর সমালোচনা করে?' ------ ।" (২১ঃ৩৬)*

*"উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে ঠাট্টা -বিদ্রূপের পাত্র গণ্য করে এবং বলে, 'এই-ই কি সেই, যাহাকে আল্লাহ রাসুল করিয়া পাঠাইয়াছেন?" (২৫ঃ৪১)*

*"সীমালংঘনকারীরা আরো বলে, তোমরা তো জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ। দেখ! উহারা তোমার কী উপমা দেয়। .......... ।(২৫ঃ ৮, ৯)*

**অভিযোগ : পূর্ববর্তীদের উপকথা :**

*"যখন উহাদেরকে বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন, তখন উহারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।" ( ১৬ঃ ২৪)*

*"....... । তাহারা তো বলে, 'এইগুলো (কুরআনের আয়াত) তো সেকালের উপকথা যাহা সে (মুহাম্মাদ) লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।" ( (২৫ :৫)*

**অভিযোগ : অলীক কল্পনা :**

*"উহারা ইহাও বলে, এই সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি।....... ।" (২১ঃ৫)*

**অভিযোগ : কুরআনের আয়াত বিচ্ছিন্ন**

*"কাফিররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবার অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হৃদয়কে ইহা দ্বারা মজবুত করিবার জন্য এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি। (২৫ঃ৩২)*

**অভিযোগ : অন্য ধর্মের কোন একব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও লিখিয়ে নেওয়া**

*আমি তো জানি, তাহারা বলে, 'তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরাবি নয়। কিন্তু কুরআনের ভাষা তো স্পষ্ট আরাবি ভাষা। (১৬ঃ ১০৩)*

*"কাফিররা বলে, 'ইহা (কুরআন) মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে (মুহাম্মাদ সঃ) ইহা (কুরআন) সে উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে*


www.nagorikpathagar.org

*এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে,' -এইরূপে উহারা (কাফিররা) অবশ্যয়ই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। তাহারা তো বলে, 'এইগুলো (কুরআনের আয়াত) তো সেকালের উপকথা যাহা সে (মুহাম্মাদ) লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।" (২৫ : ৪, ৫)*

আল্লাহ যুক্তি দেন : *"তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখ নাই যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ প্রকাশ করিবে।" (২৯ঃ ৪৮)*

**অভিযোগ : কুরআনের কিছু কিছু বিষয় ওল্ড টেস্টামেন, নিউ টেস্টামেন্ট বা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের অনুবাদ**

এ প্রসঙ্গে কুরআন নিজেই স্বীকার করছে :

*"তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা তোমার পূর্বেও কিতাবের সমর্থক। আর তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল, ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য। আর তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। ----- ।"(৩ঃ ৩,৪)*

*"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যয়ণকারী ও সংরক্ষকরূপে। ------ । ------ ।" (৫ঃ৪৮)*

এথিস্ট :

*"উহারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা উত্থিত হইব। আমাদেরকে তো এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।" (২৩ : ৮২, ৮৩)*

*"উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে' । ----- ।" (৪৫ : ২৪)*

*"উহারা বলিল, 'তোমরা আমাদের মতো মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।" (৩৬ : ১৫)*

লক্ষণীয় যে কুরআন ও মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে বিশ্বব্যপী একদল অবিশ্বাসী যেসব বিদ্রূপাত্মক বাক্য ও প্রশ্ন সচরাচর উত্থাপন করেছেন বা করছেন সেগুলো উপরোক্ত বিষয়গুলোর বাইরে নতুন কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন


www.nagorikpathagar.org

পাঠকের কাছে কৌতূহলদ্দীপক যে, একাবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগে বহু অবিশ্বাসী নিজেকে আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানী হিসেবে দাবি করছেন কিন্তু গত ১৪'শ বছরের মানব সভ্যতার অর্জিত জ্ঞানে কি তারা আদৌ কুরআনের দর্শন, রাসুল (সঃ) এবং কুরআন সম্পর্কে নতুন কোন প্রশ্ন অভিযোগ বা আক্রমণাত্মক মন্তব্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতে দুটি প্রশ্ন আলোচনা সম্ভবত অযৌক্তিক নয়।

প্রথমত : যারা অবিশ্বাসী তারা যদি তাদের এই একাবিংশ শতাব্দির আধুনিক জ্ঞানে কুরআন, ইসলাম বা নবী মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ও প্রশ্ন যা কুরআন স্বয়ং বহন করছে তার বাইরে নতুন কোন আইডিয়া বা জ্ঞান তাদের মন্তব্য,আর্টিকেল বা রচনায় সংযোজন করতে না পারেন এবং সেই একই পূরান কাসুন্দিই ঘাঁটতে থকেন তবে কি সেটি তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক নয়?

কিন্তু তা সত্ত্বেও সভ্যতার এই যুগে আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত অবিশ্বাসীদের একটি দল সেই সপ্তম শতকের আরবের অবিশ্বাসীদের মতোই– সেই একই প্রশ্ন এবং একই ভাষা, একই শব্দ ও বাক্যে কুরআন, কুরআনের দর্শন এবং রাসুল (সঃ)-কে আক্রমণ বা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য একইভাবে চর্বন করে যাচ্ছেন। সুতরাং এ মন্তব্য অসঙ্গত নয় যে, এই আধুনিক জ্ঞানী বলে দাবিদারদেরও একটি অংশের জ্ঞানের মান সেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দির অবিশ্বাসী আরবদের জ্ঞানের পর্যায়েই রয়ে গেছে।

কুরআন দাবি করছে, 'আল্লাহর কিতাব ও রাসুলদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ, বিদ্রূপ বা প্রশ্ন– সর্বকালে, সর্বযুগে একই রকম।

*"এইভাবে ইহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসুল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ।"* (৫১ঃ ৫২)

সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ১৪শ' বছরে মানব সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত অগ্রগতি সত্ত্বেও যখন ১৪শ' বছর আগের প্রশ্ন ও মন্তব্য উত্থাপিত হয়, তখন আল্লাহর বাণী ও রাসুল সম্পর্কে কুরআনে যা বলা হয়েছে- 'এই অবিশ্বাসীদের রূপ সর্বকালে, সর্বযুগে একই রকম'– সে সত্যই কি প্রমাণিত হয় না?


www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত : যারা নিজেদের বিশ্বাসী হিসেবে দাবি করেন ধরে নেওয়া যায় কুরআন, ইসলাম বা নবী মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে যে সব বিদ্রূপাত্মক বাক্য ও প্রশ্ন কুরআন বহন করছে, কোন না কোন ইবাদত ও প্রার্থনায় সচেতনভাবে হোক আর অসচেতনভাবেই হোক প্রতিদিনই তারা পাঠ করছেন। এমনকি ইসলামের প্রধান ইবাদত সালাতে দাঁড়ান অবস্থায়ও তারা এ বাস্তবতা স্মরণ করছেন। এই অবস্থায় এই একই প্রশ্ন যখন কোন অবিশ্বাসী নতুন করে উত্থাপন করেন বা উচ্চারণ করেন, তখন এ বিষয়ে কোন বিশ্বাসীর কি আদৌ গুরুত্ব দেওয়া বা তার প্রতি কর্ণপাত করার কিছু থাকে? বিশেষ করে কুরআন যখন অবিশ্বাসীদের একটি দলের কুরআনের আয়াত অস্বীকার ও কুরআন ও রাসুল (সঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত উপহাসমূলক বা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রাসুল (সঃ)-এর করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশও দিচ্ছে। এই করণীয় সম্পর্কে বহু আয়াতের মধ্যে কয়েকটি :

*"আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়; সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও; তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।" (১৫ঃ ৯৭, ৯৮, ৯৯)*

*"অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।" ( ১৬ঃ ৮২)*

*"তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না, তাহা আসন্ন না দূরস্থিত।" (২১ঃ১০৯)*

*"তোমরা যদি অস্বীকার কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়া ব্যতীত রাসুলের আর কোন কাজ নাই।" (২৯ঃ১৮)*

*"এবং তাহারা যদি তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।' (১০ঃ৪১)*

*"বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি*


www.nagorikpathagar.org

*তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও, তবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করিলে সৎ পথ পাইবে, আর রাসুলের কাজ তো কেবল পৌঁছাইয় দেওয়া।" (২৪ঃ৫৪)*

*"......... আর রাসুলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া।" (২৪ঃ৫৪)*

*"তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে ইহার (কুরআন) দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মুমিনদের জন্য ইহা উপদেশ।" (৭ :২)*

*"উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পারিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়----। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকার হইয়াছে তাহারা সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে। সুতরাং তুমি উহার দিকে আহবান কর এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করিও না। বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। -----।" (৪২ঃ ১৪, ১৫)*

*"এইভাবে তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ।" (৪২ :৩)*

তবে বিশ্বাসীদের জন্য লক্ষণীয় যে, কুরআনের কোন বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের কোন প্রশ্ন বা যুক্তি উত্থাপন এবং কুরআন ও রাসুল সম্পর্কে উপহাসমূলক বা বিদ্রূপাত্মক আলোচনা বা মন্তব্য– দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। যখন কোন অবিশ্বাসী কুরআন বা রাসুল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন বা এ সংক্রান্ত কোন বিতর্কে লিপ্ত হন তখন সে বিতর্কে অংশ গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সে প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য কার্যকারণ তুলে ধরাও বিশ্বাসীদের করণীয় হিসেবে কুরআন উপদেশ দিচ্ছে। মুক্তচিন্তার জন্য মুক্ত আলোচনা অপরিহার্য। কুরআন এ সম্পর্কে যে উপদেশ দিচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি :

*"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ইহাদের সঙ্গে তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়।" -(১৬ :১২৫)*


www.nagorikpathagar.org

*'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং অজ্ঞদের এড়াইয়া চল।' (৭ : ১৯৯)*
*'ভালো ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা ফলে তোমার সঙ্গে যাহার শত্রুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।' (৪১ :৩৪)*
*"আমার বান্দাদের যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (১৭ঃ৫৩)*
*কিন্তু যখন কোন বিতর্ক বিদ্রূপ, বিতণ্ডা, গালাগালির পর্যায়ে চলে যায় তখন কুরআন বলে, তুমি তাদের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে অন্তত সেই সময়ে আর কথা বলবে না।*
*"তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার আয়াতসমূহ সমন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসিবে না।" (৬ : ৬৮)*
*"তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক করিবে না।, তবে তাহাদের সঙ্গে করিতে পার, যাহারা উহাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং তাহার প্রতিই আত্মসমর্পণকারী।" (২৯ঃ৪৬)*
আধুনিক একাডেমিক সংজ্ঞায় 'লজিক' হচ্ছে, কোন প্রশ্নে বা বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কার্যকারণ নির্ধারণে বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অধ্যয়ন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, লজিক চিন্তা ও জ্ঞান অন্বেষণের ভিত্তি।
পবিত্র কুরআনে এই লজিকের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রায় প্রতিটি উপদেশের ক্ষেত্রে কখনো সরাসরি কখনো বা উপমা, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে ঐ উপদেশের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। কার্যকারণ বলে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদান সম্পর্কে সকল বিশ্বাসীদের জন্য অনুসরণীয় ইব্রাহীম (আঃ)- এর কয়েকটি প্রসঙ্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে :
*"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালক*


www.nagorikpathagar.org

*সমন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে কর্তত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইবরাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলিল আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহীম বলিল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদিত করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করাও তো। অতঃপর যে কুফরি করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।........। (২ঃ ২৫৮)*

*"তাহার সম্প্রদায় তাহার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্মন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমারা যাহাকে তাহার শরিক কর তাহাকে আমি ভয় করি না, সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়াত্ব, তবে কি তোমরা অনুধাবণ করিবে না। ...........। ..........। ..........আর ইহা আমার যুক্তি প্রমাণ যাহা ইব্রাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবেলায়। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ((৬ : ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩)*

আল্লাহ বলেন :

*যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে, সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে কে আর কে বিমুখ হইবে। .........। (২ :১৩০)*

*"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। .........। .........। .........। তোমরা যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের (ইব্রাহিম ও তাহার অনুসারীদের) মধ্যে। ..........।" ( ৬০ঃ ৪, ৫, ৬)*

সুতরাং বিশ্বাসীদের জন্য কোন ইসলাম কুরআন, ইমলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে উত্তম পন্থায় বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং অকাট্য গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন কুরআনের উপদেশ। এবং ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে কুরআনই বিশ্বাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য উত্তম যুক্তির উৎস সে বিষয়ে এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই ধারণা করা যায়।

বহুল আলোচিত-সমালোচিত ভারতীয় মুসলিম বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাস। এই উপন্যাসে মূলতঃ রাসুল


www.nagorikpathagar.org

(সঃ) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বিকৃত নামকরণে কাল্পনিক চরিত্র দাঁড় করিয়ে কুরআন ও রাসুল (সঃ) সম্পর্কে সেই সপ্তম শতাব্দির অবিশ্বাসীদের কুরআন ও রাসুল (সঃ) প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপাত্মক বিষয়গুলোই উপজীব্য করা হয়েছে।

'স্যাটানিক ভার্সেস' নামকরণ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকৃত ইতিহাসে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মক্কা জীবনের একটি কথিত ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে। ইবনে ইসহাকের এই মৌখিক ইতিহাস বর্ণনার সূত্র ধরে পরবর্তীতে নবম শতাব্দিতে ইতিহাসবিদ এবং কুরআনের প্রথম তাফসিরকারক আল তারাবী তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম পর্যায়ে মক্কায় রাসুল (সঃ) মক্কাবাসী কাফিরদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এই সমঝোতার শর্ত হিসেবে রাসুল (সঃ) ও তার অনুসারীরা আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি কাবায় রক্ষিত তিনটি মূর্তি লাত, উজ্জা ও মানাত-এর পূজা করবে এই শর্তে যে কাফিররা তাদের তিনটি মূর্তির পূজা করার সঙ্গে মুহাম্মাদ (সঃ) এর আল্লাহরও ইবাদত করবে। বলা হয় এই সমঝোতার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তিনটি আয়াত অবতীর্ণ করার পরই রাসুল (সঃ) এই সমঝোতায় পৌঁছান। কিন্তু সমঝোতায় পৌঁছানোর পরপরই রাসুল (সঃ) বুঝতে পারেন যে তিনি যে তিনটি আয়াত কুরআনের আয়াত মনে করেছেন সেগুলো আসলে জিবরাঈল (আঃ) বাহিত আল্লাহর আয়াত নয়। এটি শয়তান আল্লাহর আয়াত বলে তাকে বিভ্রান্ত করেছে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ রাসুলকে প্রকৃত বিষয় জানিয়ে ওহী অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তীতে সুরা নজম-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই রাসুল (সঃ) কাফিরদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি থেকে সরে যান।

ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক ও আল তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল ভুলক্রমে শয়তানের বাণীকে ওহী হিসেবে মনে করেন। আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নাজিল হওয়ার পরপরই রাসুল তার ভুল জানতে পেরে সাথে সাথে সে সমঝোতা ভেঙে দেন এবং তিনি তার নিজস্ব ধারায় আল্লাহর একাত্ববাদের বাণীর প্রচারণা চালিয়ে যান।

ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক ও আল তাবারী তাদের বর্ণনায় এই তিনিটি


www.nagorikpathagar.org

পংক্তিকে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বা 'শয়তানের পংক্তি' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

সালমান রুশদীর উপন্যাসের নামকরণ এখান থেকেই। এই উপন্যাসে অন্যতম দুই চরিত্র বোম্বের অভিনেতা ফারিশতা এবং একজন ইমিগ্রান্ট চামচা। বিমান দুর্ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার পর ফারিশতা ও চামচার কথপোকথনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। বিমান দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়ার পর ফারিশতার নাম হয় জিবরাঈল ও চামচা হয় শয়তান। উপনাস্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র মাহুণ্ড (রাসুল) এবং আয়েশা। এই সব চরিত্রের বর্ণনার মাধ্যমে লেখক কুরআনকে শয়তানের ভাষ্য হিসেবে এবং মাহুণ্ড চরিত্রটিকে একজন ভিলেন হিসেবে তুলে ধরে স্যাটায়ারধর্মী বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনের বাণীকে শয়তানের বাণী এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-কে একটি হাস্যকর চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস চালান।

তবে কুরআনকে শয়তানের বাণী এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হাস্যকর চরিত্র হিসেবে চিত্রায়ানের প্রচেষ্টা অতীতে বহুজনে করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্যাটানিক ভার্সেস পশ্চিমা মহলে এত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেল কেন? এ প্রশ্নে যে বিষয়টি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো : এই উপন্যাসটির চরিত্র উপস্থাপনা বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি উপনাসের বিচিত্র চরিত্র চিত্রয়ানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তা হলো, কুরআনে বর্ণিত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তান কুরবানি দেওয়ার প্রসঙ্গটি। এই গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, 'সন্তানকে জবেহ' এর উদ্যোগটি মানবিক দিক থেকে যেহেতু চরম বর্বরতার সুতরাং কুরআন শয়তানের বাণী ব্যতীত আর কি হতে পারে?

সালমান রুশদী তার উপন্যাসে এই যুক্তির মাধ্যমে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের দিকটি খুবই কৌশলে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্তত পশ্চিমা দুনিয়ায় হলেও বেশ কিছুটা সফল হয়েছেন।

কুরআনে সন্তান হত্যা জঘন্যতম কর্ম বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। 'পুত্র শিশুরা আমার আর নারী শিশুরা আল্লাহর কন্যা'-এই যুক্তি দিয়ে বহু পিতা তার কন্যা শিশুদের হত্যা করত এবং আরবে তা অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। এই নারী শিশুদের হত্যার বিষয়ে বেশ কয়েকটি আয়াতে


www.nagorikpathagar.org

কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

*"উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দেবে, না মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। সাবধান! উাহারা যাহা সিদ্ধান্ত নেয় তাহা কত নিকৃষ্ট!" (১৬ : ৫৮, ৫৯)*

*"তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।" (৫৩ : ২১, ২২)*

*"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?" (৮১ : ৮, ৯)*

*"তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে আমিই রিযিক দেই। এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" (১৭ : ৩১)*

সুতরাং যে কুরআন যখন নিজেই সন্তান হত্যাকে বর্বরতম কর্ম বলে অভিহিত করছে এবং কর্মের জন্য কঠোর শাস্তির সংবাদ দিচ্ছে, সেই কুরআন কিভাবে একজন রাসুলকে তার নিজ পুত্রকে জবেহ্ করার আদেশ দিতে পারে এবং কিভাবে তা একজন অনুগত ব্যক্তির সৎ ও মহৎ কর্ম বলে বর্ণনা করতে পারে– যে কোন বিবেকবান, যুক্তিরোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ প্রশ্ন উত্থাপন খুবই স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ বলেন, এই আদেশের মাধ্যমে তিনি তার প্রিয় রাসুল ইব্রাহীম (আঃ)-কে পরীক্ষা করেন এবং এ পরীক্ষা শুধুমাত্র ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যই।

আল্লাহ্ বলেন :

*"নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। ইব্রাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" (৩৭ঃ ১০৬-১০৯)*

কি এমন বিষয় ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনে যার জন্য এ কাজটি যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য মোটেও বর্বরতা নয় বরং তিনি যে প্রকৃত


www.nagorikpathagar.org

আত্মসমর্পনকারী, অনুগত, কৃতজ্ঞ এবং জ্ঞানী তার এক কঠিন পরীক্ষা মাত্র? এ প্রশ্নের খুবই শক্ত যুক্তিসংগত এবং যে কোন মানবিক গুলবলী সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অবশ্যয়ই গ্রহণযোগ্য বাধ্য জবাবটি কুরআনে বর্ণিত ইব্রাহীম (আঃ) জীবনের কয়েকটি ঘটনার মধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে :

*"উহারা বলিল, 'ইহার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।। উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।" ( ৩৭ঃ ৯৭, ৯৮)*

*"তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম।' উত্তরে সে বলিল, 'সালাম। ইহারা তো অপরিচিত লোক।*

*অতঃপর ইব্রাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, তোমরা খাইতেছ না কেন।*

*ইহাতে উহাদের সম্পর্কে তাহার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইল।*

*উহারা বলিল, 'ভীত হইও না। অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিলো।*

*তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, ''এই বৃদ্ধা-বন্ধার সন্তান হইবে। তাহারা বলিল, 'তোমার প্রতিপালক এই রকমই বলিয়াছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" (৫১ঃ ২৪-৩০)*

*"যখন ইব্রাহীম বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও।' তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।' তিনি বলিলেন, 'তবে চারটি পাখি লও এবং উহাদেরকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদেরেকে ডাক দাও, উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট চলিয়া আসিবে। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (২ঃ ২৬০)*

*"সে বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম তিনি আমাকে অবশ্যয়ই সৎ পথে পরিচালিত করিবেন।; হে আমার প্রতিপালক আমাকে*


www.nagorikpathagar.org

*এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মতো বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্রাহীম বলিল, বৎস আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করিতেছি। এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল, 'হে আমার পিতা । আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য করিল এবং ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল, তখন আমি তাহাকে আহবান করিয়া বলিলাম, ' হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে।'– এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।*

*আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানির বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোউক।" (৩৭ঃ ৯৯-১০৯)*

ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনের উল্লেখিত চারটি ঘটনার প্রথম তিনটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে যদি সর্বোচ্চ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন যুক্তিবাদী ও জ্ঞানী কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, আপনাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আপনার অভিজ্ঞতায় আপনি জানেন যে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর আপনি পুড়ে মারা যাচ্ছেন, টিক সেই মুহূর্তে এক ব্যক্তি আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ভয় করো না, আগুন তোমার কোনই ক্ষতি করবে না। আপনাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন কোথায় আগুন, এত শান্তির আবাস।

আপনার জীবনে দ্বিতীয় ঘটনা, আপনার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং বৃদ্ধা। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা সে হারিয়েছে। এমন সময় সে ব্যক্তি আপনার সামনে এসে হাজির হয়ে বলল, তুমি এক সু-সন্তানের পিতা হবে, আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন আপনার বৃদ্ধা-বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তিনি এক জ্ঞানী সন্তানের জন্ম দিলেন। তৃতীয়বার সে ব্যক্তির সামনে আপনি হাজির, আপনি বললেন তুমি তো মৃতকে জীবিত করতে পার , কিভাবে কর আমাকে দেখাও। ঐ ব্যক্তির পরামর্শে আপনি চারটি পাখিকে টুকরো টুকরো করে খণ্ডাংশ চারটি পাহাড়ে রেখে আসলেন। তারপর সে পাখিরা আপনার ডাকে জীবন্ত হয়ে আপনার ঘরে ফিরে এলো। চতুর্থবার


www.nagorikpathagar.org

ঐ ব্যক্তি হাজির, তিনি মনে মনে ঠিক করেছেন, আপনাকে তিনি পরীক্ষা করতে চান, আপনার জীবনে উল্লেখিত তিনিটি অলৌকিক ঘটনার পর তার প্রতি আপনার বিশ্বাস কৃতজ্ঞতাবোধ কতটুকু? তিনি আপনাকে আদেশ দিলেন, তোমার সন্তানকে জবেহ্ কর!

আপনার জন্য নিশ্চিতই এটি কঠিন। ঐ ব্যক্তিকে যে আপনার মতো করে জানে না, তার জন্য এই কাজটি নিঃসন্দেহে বর্বরতা, শয়তানের কর্ম! কিন্তু আপনি যদি একজন কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান, যুক্তিবোধসম্পন্ন ও জ্ঞানী ব্যক্তি হন, আপনি কি করবেন? কিম্বা এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যিনি বর্বরতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেই সালমান রুশদি আপনার স্থানে থাকেন এবং তিনি যদি কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান, যুক্তিবোধসম্পন্ন এবং জ্ঞানী হন তাহলে তিনি কি করতেন?

নিঃসন্দেহে একজন কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান, যুক্তিবোধসম্পন্ন জ্ঞানীর জন্য ঐ পরিস্থিতিতে যে কাজটি করা উচিত ইব্রাহীম সেই কাজটিই করেছিলেন।

অধিকন্তু তিনি তার নিজের বিষয়টি সন্তানের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেননি। তিনি তার সন্তানের অনুমতি প্রার্থনা করে আধুনিক উচ্চ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন একজন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটান এবং এর মাধ্যমে তার চরিত্রের মহত্বম আরেকটি দিকও প্রকাশ পায়।


www.nagorikpathagar.org

# ৩.১ ইতিহাস

ইতিহাস হলো জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যা অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করে। সহজভাবে বললে ইতিহাস অতীতের ঘটনার বিবরণ। সাধারণত কোন বিশেষ জনপদ, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ব্যক্তি বা বিষয়ের ধারাবাহিক বিবরণ যা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে ইতিহাস পদ্ধতি বা হিস্টোরিক্যাল মেথড বলা হয় যা মূলত একটি কৌশল ও পথনির্দেশ যার মাধ্যমে অতীতের কোন ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণাদি ও নথি কিভাবে গ্রহণ করা হবে বা ঐ সকল তথ্য-প্রমাণাদির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সে বিষয়গুলো নির্ধারিত করে অতঃপর তার ওপর ভিত্তি করে অতীতের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

পবিত্র কুরআন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ নয়। পবিত্র কুরআন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থও নয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, এই গ্রন্থ প্রধানতঃ মুত্তাকী বা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ, সুসংবাদ ও সকল মানুষের জন্য সতর্কবাণী ও উপদেশ, অতীতের বর্ণনা এবং অদৃশ্যের সংবাদ (বিস্তারিত কুরআন কেন পরিচ্ছদে)। যেহেতু কুরআন দাবি করছে যে, কুরআন অতীতের ঘটনাবলীর বর্ণনাও বহন করছে, সুতরাং ইতিহাসের আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে কুরআনের আরো বহু কিছুর সাথে এটির (একটি) একটি অংশ 'ইতিহাস'ও বহন করছে। কোন ইতিহাসবিদ কুরআনে উল্লেখিত ইতিহাসের এই অংশকে ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে যা-ই বলুন না কেন, প্রকৃত বিশ্বাসীদের নিকট কুরআনে অতীতের যে সকল ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তার সবই পরম সত্য। অবশ্য অবিশ্বাসীরা কুরআনের এ দাবি মানতে পারেন, যখন আধুনিক ইতিহাস পদ্ধতির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করার পর কুরআনের ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায় সে মানে উত্তীর্ণ হবে।

পবিত্র কুরআনের যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা



www.nagorikpathagar.org

পড়ার কথা, কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনায় একদিকে যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) সময় পূর্ববর্তী সূদূর অতীতের বেশ কিছু ঘটনা ও ব্যক্তির বর্ণনা রয়েছে তেমনি মুহাম্মাদ (সঃ) সমকালীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দির আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও সেই সঙ্গে মুহাম্মাদ (সঃ) ব্যক্তিগত জীবনের খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাসহ তার জীবনীর বিশাল একটি চিত্র এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সঃ) সময় পূর্ববর্তী সুদূর অতীতের প্রসঙ্গে মানব রচিত ইতিহাস স্বাভাবিক কারণেই খুবই দৈন্য সুতরাং সে বিষয়টি আলোচনা শুধু নতুন বিতর্কেরই সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ) সমকালীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দির আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনা ও অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও সেই সঙ্গে মুহাম্মাদ (সঃ) ব্যক্তিগত জীবনের খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাসহ তার জীবনীর বিশাল যে চিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- ইতিহাসের তথ্য-প্রমাণ-দলিল হিসেবে তার গুরুত্ব কতটুকু?

এ আলোচনায় তিনটি প্রশ্ন জড়িত।

১. কুরআনে বর্ণিত এইসব ঘটনাবলী মানব রচিত ইতিহাস পদ্ধতিতে আদৌ কি গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হলেও তার মান কোন পর্যায়ের?

২. মুহাম্মাদ (সঃ) সমকালীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দির আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনার যে ইতিহাস এখন পর্যন্ত রচিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদরা যে সব প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ সূত্র ব্যবহার করেছেন ইতিহাস পদ্ধতির আলোকে তার মানই বা কোন পর্যায়ের?

৩. মুহাম্মাদ (সঃ) সমকালীন বা পরবর্তী সময়ের আরবের যে ইতিহাস মানুষ রচনা করেছে সে ইতিহাস নির্মাণে ব্যবহৃত প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ-নথি ও সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনের দৃষ্টিতে তার অবস্থানটি কি?

ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একজন ইতিহাসবিদের কতগুলো সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায় রয়েছে। ইতিহাস পদ্ধতি হচ্ছে অতীতের কোন ঘটনার তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে অতীতের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান হতে হবে, একটি যুক্তিসংগত বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে।

লিখিত তথ্য ও প্রচলিত মৌখিক বর্ণনা ইতিহাসের প্রধান তথ্য-উপাত্ত


www.nagorikpathagar.org

হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। তবে সে লিখিত তথ্য ও মৌখিক বর্ণনা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা যাচাই-বাছাই করে গ্রহণযোগ্য কি-না তা প্রমাণে কতগুলো স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে। কিভাবে প্রাইমারি ও অন্যান্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য সত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে, কোন পর্যায়ের তথ্যসূত্র কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে- ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কোন সময়ে সংঘটিত কোন একটি ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ, কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হলে- ঐ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাইয়ে- ইতিহাসবিদদের সর্বজন স্বীকৃত কাঠামোয় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কোন ইতিহাস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়।

উনবিংশ শতাব্দিতে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ এ সম্পর্কে একটি কাঠামোও তৈরি করেন। এই কাঠামো অনুযায়ী তথ্য মূল্যায়ন, পরস্পর বিরোধী তথ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নীতিমালা, কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থাকলে সে প্রত্যক্ষর্দর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণের নীতিমালা, প্রত্যক্ষর্দর্শী নয় এমন কারো বর্ণনা গ্রহণ, মৌখিক বর্ণনা- ইত্যাদি বিষয়ে অন্তত অর্ধশতাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করা একজন ইতিহাসবিদের দায়ের মধ্যে পড়ে। তবে পরিস্থিতি, ঘটনার ধরন, সময়কাল ইত্যাদির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধার জন্য কোন ঘটনা বা বর্ণনার বা তথ্য যাচাইয়ে এই সবগুলো পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব না হলেও এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে যতো বেশি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ইতহাসের সে তথ্য যাচাই-বাছাই করা যায়, সে ইতিহাস হবে ততো বেশি নির্ভূল। তবে এই উনবিংশ শতাব্দির 'ইতিহাস পদ্ধতি'র সাথে তথ্যের সত্যতা যাচাই– এই একাবিংশ শতাব্দিতে সর্বাধুনিক আরেকটি যে পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে, তা হলো 'পরিস্থিতি সৃষ্টি' (সিচুয়েশন ক্রিয়েট)। এই প্রযুক্তিতে কিছু বর্ণনা বা তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার সমকালীন 'পরিস্থিতি কল্পনা' বা 'পরিস্থিতি চিত্রায়ন' করা হয় তারপর ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে দাবি করা হচ্ছে, এই পদ্ধতিতে সত্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতর সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব।


www.nagorikpathagar.org

অন্য দিকে কোন তথ্য, উক্তির ঘটনার সত্যতা যাচাই পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য বেশ কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেছে (এ গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রদান এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই সংক্রান্ত পর্বে বিস্তারিত দেখুন)। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই সকল আয়াত ও উপদেশ পাঠে, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন তথ্য, উক্তি বা ঘটনার সত্যতা যাচাই সম্পর্কিত যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য মু'মিনদের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, ইতিহাসের স্কলারগণ 'ইতিহাস সংগ্রহ পদ্ধতি'তে ইতিহাসের কোন তথ্যের সত্যতা যাচাই-এ সেই প্রায়ই একই ধাঁচের পদক্ষেপ গ্রহণের একটি একাডেমিক ছক তৈরি করেছেন উনবিংশ শতাব্দিতে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে কোন তথ্যের সত্যতা যাচাই-এ ৭ম শতাব্দিতে মানুষকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রায় ১২শ' বছর পর উনবিংশ শতাব্দিতে এসে সেই একই পদ্ধতি ইতিহাসবিদগণ ইতিহাস সংকলিত করার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করার একাডেমিক ছক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সাধারণভাবে বেশ কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে দাবি করা হয়, কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই সে আয়াত একদল লেখক লিপিবদ্ধ করতেন এবং একই সাথে অন্য একটি দল তা বারবার পাঠের মাধ্যমে মুখস্ত করতেন। আয়াত লিখিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার পর লিখিত অংশটি একটি স্থানে সংরক্ষিত করা হতো। এভাবে রাসুল (সঃ)-এর জীবিত থাকার সময়ই কুরআন লিখিত পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। সেই সাথে মুখস্ত প্রক্রিয়ায় কুরআন মৌখিক উচ্চারণে নির্ভুলভাবে রাসুল (সঃ)-এর সময়কার প্রথম পুরুষ থেকে দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ এবং এভাবেই পর্যায়ক্রমে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায় একই রূপ নিয়ে পৌঁছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রায় সাড়ে তেরশত বছর পর গত শতাব্দি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মৌখিক উচ্চারিত কোন বাণী বা উক্তি অবিকৃতভাবে সংরক্ষণে বহু প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর কুরআন সংরক্ষণে মুখস্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে না থাকলেও আবিষ্কৃত এ সকল প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি মুখস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কুরআন বহনের সে রীতি এখনও চালু আছে।

রাসুল (সঃ)-এর সময় কোন বাণী বা উক্তি হুবুহু সংরক্ষিত করার প্রযুক্তিগত উপায় ছিল দুইটি :


www.nagorikpathagar.org

১.	কোন বাণী বা উক্তি লিখিত রূপ দেওয়া

২.	বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে সেটি মুখস্ত করা

উপরোক্ত ইতিহাস যদি সত্য হয়, তবে বলা যায়, রাসুল (সঃ) কুরআন সংরক্ষণে তার সময়ের এ সংক্রান্ত দু'টি প্রক্রিয়ার সফলভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন।

তবে ইতিহাসবিদদের বড় একটি দল আছেন তারা উল্লেখিত তথ্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এই ইতিহাসবিদদের একটি একটি অংশ মুসলিম হিসেবে দাবিদার। তবে বড় অংশটি পশ্চিমা এবং ভিন্ন ধর্মালম্বী। তারা অষ্টম ও নবম শতাব্দিতে লিখিত কোন কোন ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থের তথ্যসূত্র ধরে দাবি করেন, রাসুল (সঃ) এর জীবিত অবস্থায় পবিত্র কুরআন লেখা শুরু হলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের মত হচ্ছে, রাসুল (সঃ)-এর মৃত্যুর পর ওসমান (রাঃ)-এর শাসনের সময় পবিত্র কুরআন পূর্ণাঙ্গ করে বর্তমানের রূপে লিখিত ও সংকলিত করা হয়।

তৃতীয় মতের একদল ইতিহাসবিদ যাদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাম্বলী নয়– তবে দু'একজন ইসলাম ধর্মালম্বী হিসেবে দাবিদারও আছেন, তারা অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দির লিখিত কিছু কিছু ইতিহাসের তথ্য টেনে এনে প্রমাণ করতে চান, কুরআন মূলত রাসুল (সঃ)-এর ও'ফাতের অনেক পরে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রশ্নে প্রথমত : আরাবিয় অঞ্চলের সপ্তম, অষ্টম বা নবম শতাব্দিতে লিখিত যে প্রাচীন গ্রন্থ বা লিখিত কোন নথির অস্তিত্ব বিশ্বের বিভিন্ন যাদুঘরে বা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। দেখা যাচ্ছে, ঐ অঞ্চলের সপ্তম, অষ্টম বা নবম শতাব্দিতে লিখিত যে প্রাচীন গ্রন্থ বা লিখিত যেসব নথির অস্তিত্ব বিশ্বের বিভিন্ন যাদুঘরে বা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের লিখিত নথিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বলে– এ সংক্রান্ত বিজ্ঞানী ও সকল ইতিহাসবিদ, তিনি যে মতই প্রকাশ করুন না কেন– স্বীকার করছেন। সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বামিংহ্যাম গ্রন্থাহারে কুরআনের যে অনুলিপি যাওয়া যায়– তা মুহাম্মাদ (সঃ) জীবিত থাকাকালীন লিখিত বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যানে প্রমাণিত যে কুরআনের শুদ্ধতা রক্ষা ও তা অবিকৃতভাবে সংরক্ষণে সে সময়ে


www.nagorikpathagar.org

মানুষের জ্ঞানে বাণী সংরক্ষণের সর্বত্তোম পন্থাগুলোই অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত : অষ্টম বা নবম শতাব্দিতে লিখিত বা মৌখিক কিন্তু আরো পরবর্তীতে লিখিত আকার দেওয়া হয়েছে এমন যে সকল নথি পাওয়া যায়, সে ইতিহাস যে রূপেই হোক বা হাদিস রূপেই হোক– তার সকল সূত্রই একটি তথ্যে ঐকমত্য পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) সময় থেকেই কুরআন মুখস্ত করার প্রচলিত ধারাটি বর্তমান। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এই পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের বাণী একবারে শুরু থেকে বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্ত করার বিষয়টি।

উপরোক্ত দুটি বিষয়ের সাথে কুরআনে বর্ণিত ঘটনার সত্যতা প্রশ্নে আরো কয়েকটি বিষয়ও লক্ষণীয় :

১. পবিত্র কুরআনের যে কোন পাঠকের জন্য লক্ষণীয়, কুরআন তার নিজস্ব বাণীর শুদ্ধতা রক্ষার ওপর বিভিন্ন আয়াতে কি পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ সংক্রান্ত প্রায় কয়েক শত আয়াত পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। এসব আয়াতে যেমন, অতীতে বিভিন্ন নবীর নিকট পাঠানো আল্লাহর বাণীকে কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহর আয়াত বিকৃতকরণে বা ঢেকে রাখা বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ– উদাহরণ, ব্যখ্যাসহ বর্ণনা করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের বাণী হুবুহু অবিকৃতভাবে চর্চা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এই বাণী অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের অঙ্গীকারও কুরআনে করা হয়েছে। সুতরাং যে গ্রন্থে তার বাণী বিকৃত করা হতে পারে, সে বিষয়ে বারবার সাবধানতা অবলম্বন করা ও সে বিষয়ে সতর্ক থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং এই বাণীর শুদ্ধতা রক্ষা ও তা সংরক্ষণে এত কঠোরভাবে গুরুত্বরারোপ করছে, সে গ্রন্থের শুদ্ধতা রক্ষা ও তা অবিকৃতভাবে সংরক্ষণে সে সময়ে মানুষের জ্ঞানে বাণী সংরক্ষণের সর্বত্তোম পন্থাগুলো অবলম্বন করা হবে না– এটা কোন পাঠকের কাছেই যুক্তিসংগত বা বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কথা নয়।

২. পবিত্র কুরআন একটি আদর্শ প্রচার করছে। এই আদর্শকে চিত্রিত করা হয়েছে, মহোত্তম, সত্য ও ভালো-মন্দের মূল্যবোধের মানদণ্ড হিসেবে। কুরআনে রাসুল (সঃ)-কে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কুরআনের


www.nagorikpathagar.org

আয়াত প্রচারের। যখনই কোন আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে, সেটি যে বিষয়েই হোক না কেন তা সাথে সাথে সে সময়ের সকল পক্ষের কাছে খোলামেলা বিষয় হয়েছে। এটি যেমন, যারা এই মহোত্তম ও সত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও বিশ্বাসী হয়ে রাসুল (সঃ) অনুগত– তাদের কাছে, তেমনি যারা রাসুল (সঃ) ও তার এই আদর্শের প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে চরম বিরোধিতা করেছে– তাদের নিকটেও। সুতরাং সমসাময়িক কোন ঘটনা বা যে সব ঘটনার সাথে এই উভয়পক্ষের স্বার্থই কোন না কোনভাবে জড়িত এবং উভয়পক্ষই এ বর্ণনার প্রত্যক্ষদর্শী– এ অবস্থায় এই বর্ণনায় কোন অসঙ্গতি বা অসত্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। এসব ঘটনা সম্পর্কে বা সমসাময়িক কোন দল বা ব্যক্তির কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বা অবিশ্বাসীদের ভাষায়, যে বর্ণনা কুরআনের অংশ করা হয়েছে, সেটি গোপন কিছু ছিল না বরং সে সময়ের সম্ভাব্য সর্বাত্মক উপায়ে তা সকলের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এই সব বর্ণনায় যদি অসত্য, অতিরঞ্জিত বা পক্ষপাতমূলক কোন তথ্য সংযোজিত হতো, সেটি যেমন যারা আদর্শিকভাবে রাসুল (সঃ)-এর অনুগত ছিলেন তাদের কাছে যেমন মনঃপীড়ার কারণ হত, ঠিক একই সাথে রাসুল (সঃ) অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশক্তি যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার বিরোধিতা করছিলেন তাদের জন্যও বিষয়টি হতো ইসলামের আদর্শের বিরুদ্ধে খুবই শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। এই উভয় দলের কারো পক্ষ থেকেই এ ধরনের কোন অভিযোগের দৃষ্টান্ত এমনি কথ্য ইতিহাস বা হাদিস কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না।

কুরআনে কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসুল (সঃ) বিরোধী পক্ষ কিভাবে কুরআনের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রাখত কুরআনের বহু আয়াতে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের একটি আয়াত :

*"যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা (কুরআন-পূর্ববর্তী আয়াত দ্রষ্টব্য) শোনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভালো জানি এবং ------।" (১৭: ৪৭)*

সুতরাং বাস্তবতা হচ্ছে, এই প্রকৃত মু'মিন যারা ইসলামকে একটি আদর্শিক প্লাটফরম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অথবা যারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এ প্রকাশ্য


www.nagorikpathagar.org

অথবা গোপনে বিরোধিতা করছে– এ দু'পক্ষের কারো কাছ থেকেই ইতিহাসবিদরা এমন কোন তথ্য পাচ্ছেন না, যার ফলে কুরআনে রাসুল (সঃ) কেন্দ্রিক বা তার সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যে সব ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি চিত্রিত হয়েছে সে তথ্যের নিরপেক্ষতা ও সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

৩. কুরআনে বিভিন্ন যুদ্ধে মু'মিনদের জয়-পরাজয় ও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আত্মসমালোচনা এবং রাসুল (সঃ)-এর একান্ত ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গসহ বেশ কিছু প্রসঙ্গ আছে– সেসব অংশ পাঠে– যে কোন পাঠকই উপলব্ধি করতে বাধ্য যে, কত বাস্তবতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সেসব বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধে মু'মিনদের পরাজয়ের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে- নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এমনকি অন্তরের কৃপণতা, কালিমা, লোভ-লালসা ইত্যাদি বিষয়গুলোর খুবই খুঁটি-নাটি বর্ণনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর কর্তৃত্বে রাসুলের ভূমিকা, কয়েকটি বিষয়ে রাসুল (সঃ)-এর সিদ্ধান্ত এবং তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের কিছু কিছু ঘটনার বিষয় পবিত্র কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, যদি সত্য প্রকাশে বা পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃত কোন ঘটনার বর্ণনা বিকৃতকরণ করা হতো বা কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত কোন ওহী বা বার্তা কুরআনে সংকলিত করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পক্ষে কোন ছাড় দেওয়ার সুযোগ থাকত, তাহলে সাধারণ যুক্তিবোধ অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সঃ) তার নিজের স্বার্থেই এই আয়াতগুলো কুরআনে অন্তর্ভুক্ত না করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

৪. ইতিহাস পদ্ধতিতে তথ্য যাচাই-বাছাই করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তথ্যের উৎস কোন ব্যক্তি হলে, সে ব্যক্তির মূল্যায়নের বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কুরআন ও ইতিহাস উভয়ই– মুহাম্মাদ (সঃ)-এর যে আদর্শিক চারিত্রিক গুণাবলী, মহত্ব ও সততার বর্ণনা দিচ্ছে, সে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন মানুষকে বিবেচনায় রাখলে কুরআনের তথ্য সূত্রের গ্রহণযোগ্যতার মান সম্পর্কেও একটি যুক্তসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।


www.nagorikpathagar.org

উপরের আলোচনায় ইতিহাস পদ্ধতির আলোকে কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস অংশের কতটুকু যুক্তিসংগত সে বিষয়টি সম্পর্কে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। তবে মোহাম্মাদ (সঃ) এর সমকালীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দির আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ রচনা বা মানব রচিত ইতিহাস এবং পবিত্র কুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যায় ও যে সব তথ্য-প্রমাণ-নথি বা সূত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, ইতিহাস পদ্ধতির মানদণ্ডে সেসব তথ্য-প্রমাণ-নথি বা সূত্রের সরূপটি কি আলোচনার পূর্বে এইসব তথ্য-প্রমাণ-নথির প্রাথমিক উৎসগুলো সম্পর্কে একটু দৃষ্টি দেওয়া পারে।

**তানউঈর আল মিকবাস মিন তাফসির ইবনে আব্বাস**

**১ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস**

জন্ম : ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৬৮৭

**হাদিস বর্ণনাকারী ও তাফসিরকারক**

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলা হয় তাফসিরের জনক। তাঁর নামে কুরআনের তাফসির 'তানউঈর আল মিকবাস মিন তাফসির ইবনে আব্বাস' হিসেবে পরিচিত। যদিও তার নিজ হস্তে লিখিত এই তাফসির গ্রন্থেও অস্তিত্ব নেই কিন্তু তাঁর নামে পরবর্তীতে লিখিত কুরআনের তাফসির গ্রন্থ এই 'তানউঈর আল মিকবাস মিন তাফসির ইবনে আব্বাস'– নামে পরিচিত লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন লেখক একই নামে কয়েকটি পৃথক পৃথক তাফসির গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সবগুলো তাফসির গ্রন্থ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নামে হলেও প্রতিটি তাফসিরের মধ্যে বর্ণনার পার্থক্যও যথেষ্ট। তবে কোন কোন তাফসিরে এই গ্রন্থের প্রথম লিখিত রূপদানকারী হিসেবে মাজিদ আল দীন ইবনে ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদীর নাম উল্লেখ আছে। তিনি মূলত চৌদ্দশ শতাব্দির একজন .লেখক। মনে করা হয় তিনিই প্রথম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-এর কথ্য তাফসির লিখিত রূপ দেন। ইবনে আব্বাসের নামে প্রচলিত তাফসিরেই সর্বপ্রথম সে সময়ের আরবের ইসলামের আগমনের পূর্বে থেকেই প্রচলিত কথ্য ইতিহাস, প্রচলিত কাহিনী,


www.nagorikpathagar.org

সে সময়ের বিভিন্ন গল্পকারদের বর্ণিত কাহিনী (কোসাস), ইহুদিদের বিভিন্ন গল্প- গ্রন্থে নবী-রাসুল সম্পর্কে কাহিনী (সবগুলো মিলে আরাবিতে ইসরেলীয়াত) -ইত্যাদি কুরআনের ব্যখ্যায় বিপুলভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রায় সকল তাফসিকারকই এই ধারাটি অব্যাহত রাখেন। বহুবছরের গত হওয়ার সাথে সাথে যা এখন অনেকটা কুরআনের অংশই করে ফেলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একদিকে তাফসিরকার ও অন্যদিকে হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি রাসুল (সঃ) চাচাতো ভাই। ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল (সঃ) এর ওফাতের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। তিনি আলী (রাঃ) একজন সমর্থক ছিলেন। আলী (রাঃ) খেলাফতপ্রাপ্তির পর ইবনে আব্বাসকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়, তবে মাত্র কয়েকদিন পরই তাকে সে পদ থেকে সরিয়ে দেন খলিফা আলী (রাঃ)। কিন্তু কি কারণে তাকে গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো তার কোন কারণ জানা যায় না। এরপরই তিনি হাদিস শিক্ষা ও কুরআনের তাফসির বর্ণনার মাধ্যমে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে তিনি প্রায়ই রাজধানী দামেস্ক সফর করতেন বলেও ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে নির্বাচিত খলিফা আবদুল্লাহ আল্লাহ ইবনে জুবায়ের-এর বিরোধিতা করেন। আবদুল্লাহ আল্লাহ ইবনে জুবায়ের ইয়াজিদের সাথে যুদ্ধে পারজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর ইয়াজিদ তার পূর্ণ ক্ষমতা সংহত করেন।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাফসিরের যেসকল প্রাচীন লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়- সকল তাফসিরে ইবনে আব্বাসকেই প্রথম তাফসিরকারী 'তাফসিরের জনক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবম শতাব্দিতে পবিত্র কুরআনের প্রথম লিখিত 'তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুল্ক ও তাফসীর আল তারাবী' তাফসীর গ্রন্থেও এই উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত কুরআনের (৩ঃ৭) আয়াতের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে তাফসির সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় এই প্রশ্নের উত্তরে তাফসির 'তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুলক ও তাফসির আল তাবারী'-এর লেখক ইতিহাসবিদ, ব্যাকরণবিদ, ম্যাথমেটিশিয়ান, চিকিৎসাস্ত্রিক আল


www.nagorikpathagar.org

তাবারী তার লিখিত তাফসির গ্রন্থে তার এই কর্মের পক্ষে ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি সংযোজন করেন।

কুরআনের (৩ঃ৭) আয়াত : "*তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কিছু আয়াত মুহকাম, এইগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ, যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত'; এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অন্য কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।*"

আল তাবারী বলেন, ইবনে আব্বাস কুরআনের (৩ঃ৭) আয়াতটির দ্বিতীয় বাক্য 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি,-- তার পরিবর্তে আরবিতে একটি সেমিকোলনের স্থানচ্যুত করে এভাবে– 'আল্লাহ আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না' এভাবে পাঠ করে দাবি করেন 'আমিই জ্ঞানী'।

আল তাবারীও মূলত কুরআনের আয়াতের 'ইবনে আব্বাসের' তিলওয়াত অনুসরণ করে নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে দাবি করেই তার নিজের তাফসির রচনা করেন। এ ব্যখ্যাটি তার তাফসিরে তিনি উল্লেখও করেছেন। নবম শতাব্দির এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বিশ্বের প্রাচীনতম তাফসিরের পাণ্ডুলিপি হিসেবে স্বীকৃত এবং এই পাণ্ডুলিপি ইংরেজিসহ বহু ভাষায় অনূদিতও হয়েছে।

**২. 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'**

**ইবনে ইসহাক**

ইতিহাসবিদ, ব্যাকরণবিদ, শিক্ষক

জন্ম ৭০৪ খৃষ্টাব্দ

মৃত্যু : ৭৬০ থেকে ৭৭০ এর মধ্যে


www.nagorikpathagar.org

‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’ মূলত মুহাম্মাদ (সঃ) এর সময়ের সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) এর শিশুকাল থেকে তার মৃত্যুপরবর্তী প্রায় সকল বিষয়ে যেমন– জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ থেকে ব্যক্তিগত জীবন, জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা, নবুয়াত প্রাপ্তি, ধর্ম প্রচারণাসহ মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী, তাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলী বা তাঁর জন্মপূর্ব ও মৃত্যুর পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত আরব অঞ্চলে সংগঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কবিতা আকারে ছন্দবদ্ধ মৌখিক বর্ণনা। এই ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’-এর লেখক বা বর্ণনাকারী অষ্টম শতাব্দির ইতিহাসবিদ, ব্যকরণবিদ, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক। তিনি রাসুল (সঃ)- এর ওফাতের শতাধিক বছর পর প্রধানত সে সময়ে প্রচলিত এবং নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন সুত্র থেকে সংগৃহীত প্রচলিত কাহিনী ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সঃ)এর জীবনী, সেই সাথে, মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তার সমকালীন আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী কবিতার ছন্দে রূপ দিয়ে মৌখিকভাবে তার ছাত্রদের সে সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতেন।

তার নামে প্রচলিত ইতিহাসে তিনি রাসুল (সঃ)-এর অনুসারীদের কথিত কাহিনী যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছেন একই সাথে তিনি অন্যান্য পক্ষের বর্ণিত কাহিনীও ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার কথিত ইতিহাসের ধরন দেখে মনে করা হয়, তিনি কোন বর্ণনাটি সত্য কোনটি অসত্য– এ বিবেচনায় না যেয়ে বরং সকল পক্ষের বর্ণনাই তুলে ধরার উপরই জোর দিয়েছেন। তিনি এই ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’ মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার পরবর্তী কিছু সময়ের ইতিহাসের প্রধান উৎস হিসেবে শুধুমাত্র নবম ও দশম শতাব্দির সকল ইতিহাসবিদ, লেখক ও শিক্ষক, তাফসিরকারী নয় বরং আধুনিক ইতিহাসবিদ সকল রচনা, গবেষণা বা তথ্যসূত্রের প্রধান উৎস।

আধুনিক ইসলাম ধর্মালম্বী ইতিহাসবিদ বা পশ্চিমা ইতিহাসবিদ- তিনি যেই হউন না কেন– তার বা তাদের নিজস্ব ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত সকল রচনা বা ইতিহাসগ্রন্থের মূল রেফারেন্স হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ‘সিরাত রাসুল আল্লাহ’ ।


www.nagorikpathagar.org

### ৩. যিয়াদ আল বাক্কা

জন্ম-মৃত্যু : তার জন্ম ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু জানা যায় তার জীবনাকাল ছিল অষ্টম শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে নবম শতাব্দির প্রথমার্ধ।

যিয়াদ আল বাক্কা ইবনে ইসহাকের একজন ছাত্র। ইতিহাসবিদ, বৈকরণিক, শিক্ষক ইবনে ইসহাকের মৃত্যুর অন্তত : ২৫ বছর পর ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' গ্রন্থের লিখিত রূপ প্রদান করেন বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করে।

### ৪. সালামাহ ইবনে ফজল আল আনসারী

অষ্টম শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে নবম শতাব্দির প্রথমার্ধে যিয়াদ আল বাক্কার সমকালীন প্রায় একই সময়ে ইবনে ইসহাকের আরেক ছাত্র সালামাহ ইবনে ফজল আল আনসারীও পৃথকভাবে তার শিক্ষকের মৌখিক গ্রন্থ 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' লিখিত রূপ প্রদান করেন বলে বুতু সূত্রে দাবি করা হয়। তবে, উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের মধ্যে কোনটিরই 'মূল পাণ্ডুলিপির' বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই।

### ৫. আল সিয়াহ আল নাবিয়্যাত

### ইবনে হাশিম

ইতিহাসবিদ, লেখক, ব্যাকরণবিদ

জন্ম তারিখ : অজানা

মুত্যু : ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ

'আল সিয়াহ আল নাবিয়্যাত'-রাসুল মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রাচীনতম জীবনী গ্রন্থ লেখক। রাসুল (সঃ)-এর জীবনী গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম যে গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্তমান ইবনে হাশিম তারই লেখক। তার গ্রন্থের নাম : আল সিয়াহ আল নাবিয়্যাত।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে ইবনে হাশিম তার গ্রন্থের জন্য নতুন করে তেমন কোন উল্লেখ্যযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেননি। তিনি মূলত ইতিহাসবিদ


www.nagorikpathagar.org

ও শিক্ষক ইবনে ইসহাকের ছাত্র যিয়াদ আল বাক্কাই-এর লিখিত কবিতার ছন্দে ইবনে ইসহাকের 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' গ্রন্থটির শুধুমাত্র রাসুল মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনী সংক্রান্ত একটি অংশ সম্পাদনার মাধ্যমেই তার গ্রন্থ 'আল সিয়াহ আল নাবিয়্যাত' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন।

**তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুলক ও তাফসীর আল তাবারী**

**আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আল তাবারী**

ইতিহাসবিদ, ব্যকরণবিদ, ম্যাথমেথিশিয়ান, চিকিৎসাস্ত্রিক, পবিত্র কুরআনের প্রথম লিখিত তাফসিরকারক। মূলত আল তাবারীই লিখিত তাফসিরকারকদের জনক এবং ফকিহ্ হিসেবেও পরিচিত।

জন্ম : ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আল তাবারী লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুল্ক' (রাসুল ও রাজা-বাদশাহদের জীবনী) ও কুরআনের তাফসীর 'তাফসির আল তাবারী'।

আল তাবারী কে বলা হয়, তার সময়ের অন্যতম প্রধান স্কলার। তিনি একাধারে ইতিহাস, ব্যাকরণ, অংকশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে যেমন লিখেছেন ও শিক্ষকতা করেছেন সেই সাথে তিনি কুরআনের প্রথম তাফসির লিপিবদ্ধ করেন এবং ধর্মীও শিক্ষকতাও করেন। তিনি জন্মসূত্রে একজন পার্সিয়ান হলেও তার সকল রচনা আরাবি ভাষায়। এমনকি তার রচিত প্রথম তাফসিরও আরাবি ভাষায়।

আল তাবারী লিখিত 'তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুল্ক' বা 'রাসুল ও রাজা-বাদশাহদের জীবনী' গ্রন্থটি ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এই গ্রন্থে মূলত মুহাম্মাদ (সঃ) এর সময়ের সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) শিশুকাল থেকে তার মৃত্যু পরবর্তী প্রায় সকল বিষয়ে যেমন -জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ থেকে ব্যক্তিগত জীবন, জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা, নবুয়াতপ্রাপ্তি, ধর্ম প্রচারণাসহ মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী, তাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলী বা তাঁর জন্মপূর্ব ও মৃত্যুর পরর্বর্তী কিছু সময় পর্যন্ত আরব অঞ্চলে সংগঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত


www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। এসব ঘটনার সূত্রে যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) এর অনুসারীরা আছেন সেই সাথে অন্যান্য সূত্র থেকে ও তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা বা বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমন কি স্যাটানিক ভার্সেস কাহিনীর এই গ্রন্থেই উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসবিদের অভিমত হচ্ছে, আল তারাবি মূলত ইতিহাসবিদ ও শিক্ষক ইবনে ইসহাকের ইতিহাসেরই লিখিত রূপ দিয়েছেন। মূলত 'তারিকাহ আল-রাসুল আল-মুলক' গ্রন্থটি ইবনে ইসহাকের 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'-এর সম্পাদিত লিখিত রূপ মাত্র।

আল তাবারী নবম শতাব্দিতে পবিত্র কুরআনের প্রথম লিখিত তাফসির 'তাফসির আল তারাবী' গ্রন্থের রচয়িতা। পরবর্তী এই ধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। তিনিই তার গ্রন্থে ইবনে আব্বাসকেই প্রথম তাফসিরকারী বা 'তাফসিরের জনক' হিসেবে উল্লেখ করেন কুরআনের (৩ঃ৭) আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের পঠনরীতি সমর্থন করে তার নিজ তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। আল তারাবীর গ্রন্থসমূহই ইসলামের ইতিহাসের প্রচীনতম পাণ্ডুলিপি হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত।

উল্লেখিত চারটি সুত্র ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি সূত্র মানব রচিত ইতিহাসের ব্যবহৃত হয়েছে– তবে তার ব্যবহার খুবই নগণ্য পর্যায়ে। এসব উৎস হচ্ছে :

**কিতাব সুলাইম ইবনে কায়েস**

**সুলাইম ইবনে কায়েস**

জন্ম : অজানা

মৃত্যু : ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ

কথ্য বর্ণনা

জীবনী ও হাদিস

**উরওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের**

জন্ম : অজানা

মৃত্যু : ৭১২


www.nagorikpathagar.org

উরওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের খোলাফয়ে রাশেদিনের সময় মদিনার ৭ জন কাজীর একজন। (কথ্য বর্ণনা)

**আল জুহ্রী**

রাসুল (সঃ) এর জীবনী ও হাদিস লেখক (কথ্য বর্ণনা)

**টিচিং অব জ্যাকব**

জ্যাকব, ইয়াহুদি থেকে খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত একজন জাজক

**সফরোনিয়াস অব জেরুজালেম**

৫৬০- ৬৩৮

খলিফা ওমরের সময় জেরুজালেম চার্চের প্রধান বিশপ।

সুতরাং ইতিহাসবেত্তাগণ অষ্টম ও নবম শতাব্দিতে লিখিত যেসব ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থ বা অন্যান্য তথ্যসূত্র তাদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে কুরআন ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবনী, মুহাম্মাদ (সঃ) এর সমকালীন ইতিহাস বা তাদের ভাষায় ইসলামের ইতিহাস রচনা করেছেন, তার সবগুলোই লিখিত হয়েছে শ্রুতিকথা ভিত্তিক মৌখিক বর্ণনা থেকে এবং অষ্টম, নবম এবং দশম শতাব্দিতে ঐ সকল মৌখিক বর্ণনার কিছু কিছু নিয়ে লিখিত গ্রন্থ এই সকল ইতিহাসের প্রধান উৎস। এই ইহিতাসের মূল উৎস একটিই এবং তা হচ্ছে ইতিহাসবিদ, বৈকরণিক ও শিক্ষক ইবনে ইসহাক রচিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'। এই 'সিরাত রাসুল আল্লাহ'-কে গ্রন্থ বলা হলেও এটি মূলত ইবনে ইসহাকের কবিতা আকারে রচিত মৌখিক 'বর্ণনা' যা তিনি তার ছাত্রদের কাছে বয়ান করতেন। প্রায় সকল ইতিহাসবিদের মত হচ্ছে, এই একটি প্রধান উৎসকেই কেন্দ্র করে পরবর্তীতে অষ্টম শতাব্দির শেষের দিকে ও প্রধানত নবম শতাব্দিতে কয়েকজন ইতিহাসবিদ পৃথক কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত রূপ দেন। প্রায় একই সময়ে বেশ কয়েকজন ইমাম রাসুল (সঃ)-এর নামে প্রধানত মৌখিকভাবে প্রচলিত তার দৈনন্দিন জীবন-যাপন, ধর্মচর্চা সংক্রান্ত বাণী, উক্তি এবং একই সম্পর্কিত রাসুল (সঃ) জীবনের কিছু ঘটনাবলী, কর্মকাণ্ড লিখিতভাবে সংকলিত করেন যা পরবর্তীতে সুন্নাহ ও হাদিস নামে ব্যপক পরিচিত লাভ করে।


www.nagorikpathagar.org

অবশ্য এর আগে সপ্তম শতাব্দির শেষের দিকে এবং অষ্টম শতাব্দির প্রথমভাগে মৌখিকভাবে হাদিস শিক্ষাদান সে সময়ের প্রচলিত রীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ সময় বেশ কয়েকজন ইমাম নিজ নিজ নামে অনেকটা মক্তব আকারে হাদিস শিক্ষা প্রদানে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ক্ষুদ্র আকারে হাদিসের লিখিত রূপও দেন। অবশ্য তাদের এই লিখিত গ্রন্থগুলো পরবর্তীতে তাদের ছাত্রদের মাধ্যমে কোনটি লিখিত বা কোনটি লিখিতরূপ ছাড়াই মানুষের স্মৃতিতে থাকলেও সে মূল গ্রন্থগুলোর কোনটিরই বর্তমানে অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সেই সাথে হাদিস বিষয়ে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের ইতিহাস পাঠে আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো তা হলো : খুব সম্ভবত তৎকালীন শাসকদের আগ্রহের কারণেই হাদিস শিক্ষা দান বা হাদিস সংক্রান্ত জ্ঞান সে সময়ে জীবিকা অর্জনের অন্যতম মর্যদাপূর্ণ সহজ পথ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে রাজকীয় পদে বহাল বা রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রাপ্তির মতো কোন কাজে মনোনীত হওয়ার জন্য সম্ভবত এই হাদিস শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে হাদিস শিক্ষা যেমন দ্বীন-ই শিক্ষা লাভ বলে বিবেচিত হয়েছে অন্যদিকে এই শিক্ষা পেশাগত সাফল্যলাভের মানদণ্ড বিবেচিত হওয়ায় এই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সাধারণভাবে মানুষের বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়।

আধুনিক যুগের ইতিহাসবিদগণ তিনি প্রাচ্যের হোন বা পশ্চাত্যেরই হোন– মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবনী, মুহাম্মাদ (সঃ) এর সমকালীন ইতিহাস বা তাদের ভাষায় ইসলামের ইতিহাস রচনার গবেষণায় অষ্টম ও নবম ও দশম শতাব্দিতে লিখিত ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থ বা অন্যান্য তথ্যসূত্র তাদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি তারা পবিত্র কুরআনের ইতিহাস এবং সেখানে উল্লেখিত বিষয়সমূহের ব্যখ্যায় বা তাদের ভাষায় কুরআনের অর্থ উদ্ধারে অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দিতে লিখিত ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থ বা অন্যান্য তথ্যসূত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। উপরন্তু পবিত্র কুরআনের এমন বহু অনুবাদক আছেন, যারা অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দিতে লিখিত ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থের প্রতি এতোটাই বিশস্ত যে তাদের অনুবাদে কুরআনে ব্যবহৃত বহু আরাবি শব্দ ও


www.nagorikpathagar.org

বাক্যের মূল অর্থ পরিবর্তন করে ঐসব গ্রন্থে বর্ণিত বর্ণনা ব্যবহার করে কুরআনের অনুবাদ এবং তাফসির হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন!

এর বাইরে সে সময়ের যেসব তথ্য, বর্ণনা বা নথি ইতিহাস বা হাদিস হিসেবে যা বর্তমানকাল পর্যন্ত পৌছেছে তার সকল তথ্যের প্রাথমিক উৎস 'শ্রুতিমাত্র'।

বারবার কোন পাঠ আবৃত্তি করার মাধ্যে দিয়ে মুখস্তকরণ প্রক্রিয়ায় স্মরণ রাখা এবং কারো কোন উক্তি একবার মাত্র শ্রবণের মাধ্যমে সেটি ধারণ করা- এ দুটি প্রক্রিয়ার সংরক্ষিত যে কোন মানদণ্ডে 'তথ্য বা মূল উক্তি'-এর গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে গুণগত মানে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। শ্রোতার মুখ থেকে ক্ষণিকের জন্য একবার শ্রবণ করার পর সে 'বার্তা' যখন মৌখিকভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা পরবর্তীতে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছানো হয়– সে বার্তার মান এবং বক্তার উপস্থিতিতে এবং তারই উদ্যোগে তারই একটি উক্তি কোন ব্যক্তি বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে আত্মস্থ করেন এবং তিনি একই পদ্ধতিতে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির বা একইভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌছান - তখন এই দুটি ক্ষেত্রে সে 'মূল বার্তা'র মান কখনো এক হতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোন একজন বক্তার বক্তব্য একবার শোনার পর একজন শ্রোতা তার স্মরণশক্তির মান যত উচ্চতর পর্যায়ের হোক না কেন তা তৃতীয় কারো কাছে হুবহু বর্ণনা বাস্তবে সম্ভব নয়। তিনি হয়তো মূল বক্তার বক্তব্যের একটি সার-সংক্ষেপ তুলে ধরতে পারেন– কিন্তু উক্তি আকারে হুবহু প্রকাশ দাবি করা সত্যের অপলাপ মাত্র।

কোন ঘটনা বা কারো আচার-আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে একজন প্রত্যক্ষদর্শী তার দেখা পর্বের বাহ্যিক একটি বর্ণনা দিতে পারেন অনেকটা নির্ভুলভাবেই। কিন্তু অনুসন্ধান ছাড়া সেই ঘটনার আরো যেসব দিক থাকতে পারে– সে দিকগুলো সে বর্ণনায় অনুপস্থিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ফলে সে ঘটনার বাস্তব পূর্ণাঙ্গরূপ ঘটনার সাথে কোন ব্যক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না থাকলে কেবলমাত্র বহ্যিক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ঘটনার কেবল একটি দিকই প্রকাশ পায়। সেই সাথে, একটি ঘটনার সাথে স্বার্থ জড়িত এমন কোন পক্ষ বা ব্যক্তির বর্ণনার সাথে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটিও জড়িত।


www.nagorikpathagar.org

একই ঘটনা দ্বিতীয় কারো দ্বারা সত্যায়িত না হলে তা শুধু প্রথম বর্ণনা বিভ্রান্তিই বাড়িয়ে দিতে পারে।

সুতরাং সাধারণভাবে কোন বক্তার কোন উক্তি বা কোন ঘটনার বর্ণনা কমপক্ষে দু'জন ভিন্ন শ্রোতা বা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিন্ন বর্ণনা বা অন্য কোন একটি তথ্য সূত্রে বা নথির মাধ্যমে যাচাই ছাড়া সেটি সঠিক বলে গণ্য করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। উপরোক্ত প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বিবরণ খুব কমক্ষেত্রেই দুজন ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত। লক্ষণীয়, যে দু'একটি ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তি একই ঘটনার বিবরণ দিয়ে, সে বিবরণ ইতিহাসের সূত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হোক, তাফসিরে ব্যবহার করা হোক অথবা সিয়াহ সিত্তায় সংকলিত হোক– দুজনের বর্ণনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যা শ্রুতিনির্ভর বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক।

অন্য দিকে রাসুল (সঃ)-এর জীবন একটি প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ জীবন। এই সংঘাতে বিভিন্ন পক্ষ জড়িত। এইসব পক্ষের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ছিল। পবিত্র কুরআনে এই সংঘাতের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এটি যে কতোটা সংঘাতপূর্ণ, কত ধরনের পক্ষের স্বার্থ যে এই সংঘাতের সাথে আবর্তিত সে বর্ণনা পবিত্র কুরআন থেকেই জানা যায়। সুতরাং এইসব পক্ষের কোন একটি যখন মুহাম্মাদ (সঃ) বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন কোন উক্তি করেন বা কোন ঘটনার বর্ণনা দেন তখন সে বর্ণনা অবশ্যয়ই দ্বিতীয় একটি বর্ণনা বা তথ্য সূত্র বা নথির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা ছাড়া সেটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন উত্থাপন খুবই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে এইসব পক্ষগুলোকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অবশ্য পবিত্র কুরআনে এইসব পক্ষগুলোতে জড়িত কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই দ্বন্দ্বে কোন একটি সংঘবদ্ধ পক্ষের কি অবস্থান, মনোভাব এবং তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত এই পক্ষগুলোর মধ্যে যেমন আছে রাসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণাকারী বিভিন্ন দল, ইসলামের প্রসারে বাধাদানকারী চিহ্নিত বহি :শক্তি সেই সাথে মুসলিম হিসেবে দাবিদার বা বিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের ঘোষণাদানকারীদের একটি বড় অংশও বিভিন্নভাবে মুহাম্মাদ (সঃ)এর বিরোধিতা করেছে তার বিস্তারিত বর্ননাও


www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এই অভ্যন্তরিণ বিরোধী অংশটি কখনো প্রকাশ্যে এবং কখনো গোপনে মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের প্রধান হাতিয়ার ছিল, মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রটনা, এবং ঘটনার বিবরণ বিকৃতকরণ। এ বিষয়ে কুরআন পাঠকের কাছে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মক্কা-মদিনার নিকটবর্তী এলাকায় মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী বহিঃশক্তি দিন দিন যত দুর্বল হয়েছে, মুহাম্মাদ (সঃ) মদিনার অভ্যন্তরীণ এই মুনাফিকদের কাছ থেকে ততো প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে থাকেন।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মানুষের এই প্রবৃত্তি সার্বজনীন। কুরআনের বর্ণনার ১৪'শ বছর পরেও তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তির সবোর্চ্চ উৎকর্ষতার বর্তমান এই যুগেও সংঘাতে লিপ্ত প্রতিপক্ষের উক্তি বিকৃতিকরণ, চরিত্রহনন, সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি হিসেবেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির স্বার্থে অথবা শুধুমাত্র কারো প্রতি রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ বা আবেগের বশবর্তী হয়ে অসত্য প্রচার, অতিরঞ্জন এখনও প্রতিনিয়ত ঘটছে । এসব অসত্য, অতিরঞ্জন রটনা ও প্রচারণা কোন কোন ক্ষেত্রে টেকসইও হচ্ছে।

মুহাম্মদ (সঃ) বিরোধীদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড কি পর্যায়ে পৌঁছে তারই একটি ধারণা পাওয়া যায়, মক্কা বিজয়ী পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে এই 'মুনাফিক' সম্পর্কে ক্রমাগত অধিকহারে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ থেকে। এই মুনাফিকদের গুজব রটনার মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছে, তারও ধারণা কুরআন থেকে পাওয়া যায়। এ জন্য নিচে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো :

"*মুনাফিকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে অভিশপ্ত হইয়া----- ।" (৩৩ : ৬০, ৬১)*

এত গেল রাসুল (সঃ) এর বিরোধী সঙ্গবদ্ধ প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিত প্রচারণা প্রসঙ্গ।

কিন্তু সে সমাজে সাধারণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বা সংস্কৃতির অংশ


www.nagorikpathagar.org

হিসেবে 'রটনা' বিষয়টি যে তাদের কাছে বেশ আর্কর্ণীয় ছিল সে বর্ণনাও পবিত্র কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। সেই সময়ে সাধারণ মানুষ যে কোন রটনা সহজেই সত্য হিসেবে বিশ্বাস করত, এমন কোন একটি প্রসঙ্গ পেলে এক কান থেকে আরেক কানে অতিরঞ্জিত করে পৌঁছে দেওয়া, এই শ্রুতিকথা সত্য হিসেবে গ্রহণ সেটি নিয়ে আলোচনায়-সমালোচনায় মগ্ন হওয়া, পরস্পরের চরিত্র হনন এবং সে বিষয়টি তৃতীয় কারো কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া- সে সংস্কৃতিও যে পূর্ণমাত্রায় বিরজামান ছিল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি মু'মিন হিসেবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পরও সাধারণ মুমিনদের একটি অংশের মধ্যেও যে এই সংস্কৃতি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল নিচের কয়েকটি আয়াত পাঠে সে সত্যই প্রকাশিত হয় :

*"যাহারা এই অপবাদ রচনা করিয়াছে, তাহারা তো তোমাদেরই (মু'মিনদের) একটি দল। ---- -। যখন তাহারা ইহা শুনিল, তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করিল না এবং বলিল না, 'ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।' তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহর নিকট মিথ্যেবাদী। ------। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে, যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ইহা গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এই বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; --- ।" (২৪ঃ ১১-১৬)*

*"হে মু'মিনগণ। মুসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন---।" (৩৩ঃ ৬৯)*

*"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম।' নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ সম্মন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।" (১৬ঃ ১১৬)*

*"যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে।*


www.nagorikpathagar.org

*তাহাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে মঙ্গল তাহাদেরই জন্য। --------।" (১৬ঃ ৬২)*

*"উহাদের অধিকাংশই অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না-------" (১০ঃ৩৬)*

*"------ তোমরা এক অপরের দোষারূপ করিও না এবং তোমরা এক অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না;-------। (৪৯ :১১)*

*"হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক.......... তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং এক অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না।------- --।"-(৪৯ :১২)*

এমন কি মু'মিন হিসেবে নারীরা যখন অঙ্গিকারবদ্ধ হয় তখন কি কি বিষয় তাদেরকে অঙ্গিকার করতে হয়েছে সে চিত্রও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

*"হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে তাহারা আল্লাহর শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যাভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না------। " (৬০ঃ১২)*

উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট যে রাসুল (সঃ)-এর সমকালীন আরবে সে সময়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গুজব, অপবাদ রটনা এবং তা প্রচার করা সংক্রান্ত  বিষয়গুলো কি জোরালভাবে প্রচলিত ছিল।

উপরন্তু, মু'মিনদের কেউ কেউ যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নিজেদের কোন কৃতকর্মের কৃতিত্ব জাহির করার অংশ হিসেবে সত্য-অসত্য মিলিয়ে তার নিজের বা নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা বা কর্মকাণ্ড অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করতেন সে তথ্য কুরআনই আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, সেই সাথে এধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সাবধান হওয়ারও উপদেশ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করতে পারি :

*"হে মু'মিণগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" (৬১ :২,৩)*

*"যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা*


www.nagorikpathagar.org

*নিজেরা করে নাই এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালোবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে– এইরূপ তুমি কখনো মনে করিও না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" (৩ : ১৮৮)*

কুরআনের উল্লেখিত বর্ণনায় রাসুল (সঃ)-এর সমকালীন একটি সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। যারা একটি বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সমাজিক পরিবর্তনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের মধ্যেই যখন অসত্য রটনা, অস্তিহীন বিষয়ের অস্তিত্ব দান এবং ঘটনার অতিরঞ্জন ও বিকৃতির এই অবস্থা তখন যারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে দ্বন্দ্বে জড়িত এবং যাদের সততার প্রশ্নে কোন অঙ্গীকার নেই তারা এই রটনা সম্পর্কে কতটুকু অগ্রণী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান মোটেও অযৌক্তিক হবে না যে, এই প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাসুল (সঃ) এর প্রতিপক্ষ যেমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য রটনা, অস্তিহীন বিষয়ের অস্তিত্ব দান এবং ঘটনার অতিরঞ্জন ও বিকৃতি এক দিকে যেমন করেছে, তেমনি অন্য দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অংশ হিসেবেও সে কর্মটি হয়েছে। এ কাজটি যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতিপক্ষ তাকে হেয় করার জন্য করেছে, তেমনই মুহাম্মাদ (সঃ) এর কোন কোন অনুসারীও রাসুল (সঃ) সম্পর্কে অতিরঞ্জন, তার অলৌকিক ঘটনাসহ বিভিন্ন মিথ প্রচারেও মোটেও কার্পণ্য করেন নি। এসবের বহু কিছুই পরবর্তীতে ইতিহাস ও হাদিসের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মনে না করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। উপরন্ত এসব বর্ণনা যখন উৎস থেকে কথ্য আকারে আরো তিন চার পুরুষ চর্বিত হওয়ার পর লিখিত আকার পায় তখন ঐ লিখিত রচনার মধ্যে কি পরিমাণ শব্দ ও বাক্য কুরআনের ভাষায় 'শয়তান প্রক্ষিপ্ত' করেছে, যে কোন বোধসম্পন্ন মানুষ তা সহজেই আঁচ করতে পারেন। উল্লেখিত আলোচনায় মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনী এবং তার সমকালীন আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি সম্পর্কে 'ইতিহাস পদ্ধতি'র দৃষ্টিতে কুরআন ব্যতিত অন্য যে সকল সূত্র থেকে যে তথ্য-উপাত্ত-নথি ও বর্ণনা পাওয়া যায় সত্যের মানদণ্ডে তার বাস্তব অবস্থানটি সহজেই অনুমেয়। অন্য দিকে কুরআনের আলোকেও ঐ তথ্য-উপাত্ত-নথি ও বর্ণনা বা ঐসব তথ্য-উপাত্ত-নথি ও বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে


www.nagorikpathagar.org

যে ইতিহাস, তাফসির বা কুরআনের আয়াতের ব্যখ্যা করা হয়েছে– সেসবের মানও কোন পর্যায়ে সে সত্যও স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। একই সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ইতিহাস কাঠামো গড়ে উঠেছে তার আলোকে কুরআনের ইতিহাস অংশটি যে প্রকৃত ইতিহাস রচনায় কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সে দিকটিও স্পষ্ট হওয়ার কথা।

সুতরাং অনুমান, অর্ধসত্য অথবা মিথ্যা দিয়ে একটি সত্যকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা ও সে সত্যের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা মূর্খতা ছাড়া আর কি হতে পারে! কিন্তু দুঃজনক হলেও এটাই বাস্তবতা যে ইতিহাস রচনা অথবা কুরআনের ব্যখ্যা-বিশ্লেষন ও তাফসিরের নামে সে কাজটিই করে এসেছেন যেমন একদল বিশ্বাসী বলে দাবিদার স্কলার এবং একদল অবিশ্বাসী ইতিহাসবিদ।

সম্ভবত এ কারণেরই কুরআন মানবজাতিকে পূর্বেই সাবধান করেছে এভাবে :

*"-------সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে--------।" (১০ :৩২, এবং ৩৩)*

*"উহাদের অধিকাংশই অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না-------" (১০ :৩৬)*

*"পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ব করে নাই তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও উহার পরিণাম উহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। এইভাবে উহাদের পূববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, সুতরাং দেখ জালিমদের পরিণাম কী হইয়াছে।" (১০ :৩৯)*

*"যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়াত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কেমন করিয়া।" ( ১৮ :৬৮)*

*"..........-----। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে। মানুষ যাহা চায় তাহাই সে কি পায়?" ( ৫৩ঃ ২৩, ২৪)*

*"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ -------? -----।" ( ৪৯ :১২)*


www.nagorikpathagar.org

# ৩.২ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, মানুষের কার্যাবলীর মধ্যে আগে ধর্মের উদ্ভব এবং এই ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত ধর্মকে সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করেন। তৃতীয় একটি পক্ষ মনে করেন, মানুষের আদি সংস্কৃতি ধর্ম থেকেই উদ্ভব কিন্তু সভ্যতার একটি পর্যায়ে মানুষের কর্মকাণ্ড ব্যাপকতর হওয়ায় সংস্কৃতি ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাধারণ সংজ্ঞায় 'ধর্ম ও সংস্কৃতি'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ খুব কঠিন। খুব স্বাভবিক অবিশ্বাসীরা তাদের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতি বলবেন। আবার বিশ্বাসীদের এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি মনে করেন তার সকল কর্মকাণ্ডই ধর্ম। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড বিশ্বাস, আচার-আচারণ, মূল্যবোধ, চলাফেরা, পোশাক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উৎসব, কথাবার্তা, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি রান্না, দাঁড়ানোর-বসার ভঙ্গি সবই সংস্কৃতি। সুতরাং যিনি ধর্মই মানেন না তার সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতি। আবার এমন ব্যক্তিও থাকতে পারেন যার সকল কর্মকাণ্ডই ধর্ম, তিনি দাবি করেন এ সকল কর্মকাণ্ডই তিনি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী করছেন।

আরেকদল পণ্ডিত ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থ্যকের একটি রেখা টানতে চেয়েছেন। তাদের মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের যে কর্মকাণ্ডগুলো ধর্মীয় বিধানের কারণে যুগ যুগ ধরে সমাজে (সর্বযুগে, সব সমাজে) একই রূপে বিদ্যমান সেটি ধর্ম এবং যে কর্মকাণ্ডগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়, সেগুলো সংস্কৃতি। সম্ভবত সংস্কৃতি সম্পর্কে কুরআনের বিধানের সাথে এই মতটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্র কুরআন মানুষ সৃষ্টিসংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে ধারণা দিচ্ছে যে, ধর্মের বাণী দিয়েই আল্লাহ আদমকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ বর্ণনায় বিশ্বাসীদের কাছে সত্য হচ্ছে, ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব। কিন্তু কুরআন বিধান ও



www.nagorikpathagar.org

উপদেশ সুনির্দিষ্টভাবে এই সংস্কৃতির কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করছে?

'ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' নামে একটি পৃথক 'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' ইসলাম ধর্মের অংশ বলে বহুজনে দাবি করেন। এই কর্মটি স্থান, কাল, পাত্রের মধ্যে বৈচিত্রের ইতি টেনে বিশ্বব্যাপী সকল বিশ্বাসী মানুষকে একই 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে'র ধারক হিসেবে রূপায়নের চেষ্টা।

সেই সঙ্গে এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ইসলাম সংক্রান্ত একডেমিক বা অন্য সাধারণ আলোচনায় ইসলামের অংশ হিসেবে দাবি করে ধর্মের রূপরেখা ও কাঠামো নির্মাণের উপাদান, উদাহরণ ও প্রমাণ-দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। একইভাবে এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যখ্যাদানে উপাদান, উদাহরণ ও প্রমাণ-দলিল হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে এই কর্মটি বিশ্বব্যপী নৃতাত্বিক বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটি তীব্র দ্বান্দিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ কাজটি দুটি পদ্ধতিতে করা হয়েছে বা করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রথমত : শক্তি প্রয়োগে; দ্বিতীয়ত সেচ্ছায়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এ বিষয়ে কুরআনের অবস্থানটি কি?

এ আলোচনায় ধর্ম পালনে শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কিত কুরআনের অবস্থানটি স্পষ্ট। এ নিয়ে নিয়ে অবশ্য কিছুটা আলোচনাও হচ্ছে। এ বিষয়ে কুরআনে পরস্পর সম্পর্কিত বহু আয়াত আছে এবং এ সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যাও এর মধ্যেই নিহিত। তবে লক্ষণীয় হচ্ছে, এসংক্রান্ত অধিকাংশ আলোচনায় কুরআনের একটি- দুটি আয়াত ব্যবহার করে বাকিটা ইতিহাস- ঐতিহ্য, হাদিস ইত্যাদি ব্যবহার করে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি।

এ সম্পকির্ত ইসলামের বিধান ব্যখ্যা করার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের যে কয়েকটি আয়াতের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

*"দ্বীন গ্রহণে কোন জবরদস্তি নাই; সত্য ভ্রান্ত হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনো ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,*


www.nagorikpathagar.org

*প্রজ্ঞাময়।।" (২ :২৫৬)*

*"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। -------। -------।" (২ :২৭২)*

*".........---। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা।---।" (৩ :২০)*

*"কেহ রাসুলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহর আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই।" (৪ :৮০)*

*"যাহারা দ্বীন সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাহাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারবভুক্ত। আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।" (৬ :১৫৯)*

*"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই ঈমান আনিত, তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য জবরদস্তি করিবে? আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নয় এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।" (১০ :৯৯,১০০)*

*"উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদের ওপর জবরদস্তিকারী নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।" (৫০ :৪৫)*

*"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসুলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা।" (৬৪ :১২)*

এ সিরিজে কুরআনের আরো বহু আয়াত যুক্ত হতে পারে এবং সে কাজটি করা হলে এ সংক্রান্ত কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্য আরো সুস্পষ্ট হবে বলাই বাহুল্য। তবে শুধুমাত্র উপরোক্ত আয়াতসমূহ একত্র করলে যে ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় তা হলো : কুরআন কোন মানুষের আত্মসমর্পণকারী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবেই তার 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' নিশ্চিত করেছে। কিন্তু একজন 'আত্মসমর্পণকারী' বা 'প্রকৃত বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে কুরআন তার সংস্কৃতির স্বাধীনতা কতটুকু খর্ব করছে ?


www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কোন ব্যক্তি তার নিজ নৃতাত্বিক জাতি, গোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লালনে কুরআনের আলোকে কতটা স্বাধীন এবং কোন নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী, পরিবারের নিজস্ব 'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' ইসলামের কোন বিধান হতে পারে কি না ?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। রাসুল (সঃ) তার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর তার স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করেন এবং বিভিন্ন বয়সী মু'নিরাও সে সম্প্রদায়েরই সদস্য ছিলেন। সুতরাং খাদ্য, খাবার গ্রহণের ভঙ্গি, রান্নার ধরন, দাঁড়ান, বসার ভঙ্গি, পোশাক-আশাকসহ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ আরো বহু বিষয়ে তারা যেভাবে অভ্যস্থ ছিলেন নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসুল (সঃ) বা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর মুমিনগণ তার কতটুকু বা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছেন?

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কুরআন কোন কোন বিষয়ে রাসুল (সঃ) ও মুমিনদের মধ্যে পরিবর্তন আনার আদেশ উপদেশ দিচ্ছে ?

এ দুটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া কঠিন কিছু নয়। কুরআন যেহেতে স্বরূপে বর্তমান সুতরাং রাসুল (সঃ) ও মু'মিনদের জীবনের কোন কোন বিষয় পরিবর্তন আনার কথা বলা হচ্ছে কুরআন পাঠে সহজেই তা জেনে নেওয়া যেতে পারে এবং এটুকু হচ্ছে, প্রকৃত সত্য। এই প্রক্রিয়াট যথাযথভাবে করা সম্ভব হলে কোনটি ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন বিধান এবং কোনটি আরবের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন সম্ভব। একই প্রক্রিয়ায় কোনটি বিশ্বাসীদের জন্য সার্বজনীন ধর্ম এবং কোনটি তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ এবং তার মধ্যে যা 'উত্তম তা গ্রহণ কর' এই সাধারণ মূল্যবোধের আওতায় বিবেচনা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাও স্পষ্ট হতে পারে।

এই সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট বিধান ব্যতীত মানুষের বাকি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেস্থান, কাল, পাত্রভেদে সকল বিশ্বাসীর জন্য সাধারণ বিধান বা উপদেশ হচ্ছে, 'যা উত্তম তা গ্রহণ করো' :

*"আমার বান্দাদের যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (১৭ :৫৩)*


www.nagorikpathagar.org

*"যাহারা তাগুতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।" (৩৯ :১৭, ১৮)*

এ বিষয়ে সমগ্র কুরআন পাঠেই কেবল পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে কুরআন যে সে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই স্পষ্ট ধর্মীয় বিধান দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট করে নি বাকি অংশটুকু মানুষের ইচ্ছাধীন সে সম্পর্কে বহু আয়াত আছে তার একটি :

*"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর আয়াতসমূহের (নিদর্শনসমূহের) অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কারাগৃহের হজ্জ কিম্বা উমরাহ সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সাঈ করিলে তাহার কোন 'পাপ' নাই আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করিলে আল্লাহ তো পূরস্কার দাতা।" (২ঃ ১৫৮)*

উপরোক্ত আয়াতের সাথে ২ : ৬৭-৭০; ২ : ১০৮ এবং ৫ : ১০১ ও ১০২ আয়াতগুলোতে (বিস্তারিত দেখুন এই গ্রন্থের হাদিস পরিচ্ছদে) এ সম্পর্কিত উপদেশ যোগ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ফলে কুরআনের বিধানের অধীনেই মানুষ স্থান, কাল, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভেদে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ঔৎকর্ষতার প্রতিফলন ঘটানোর বিপুল স্বাধীনতা যেমন দেওয়া হয়েছে একউ সঙ্গে মানুষ  বৈচিত্র্যময় নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে জীবন-যাপন ও কর্মসম্পাদনের বিশাল সুযোগ রয়েছে। মানুষের কর্মের এই স্বীকৃতি কুরআনের বহু বাণীর মধ্যে রয়েছে। এই ব্যাখ্যটি যেমন কয়েকটি স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া হয়েছে, তেমনি সহযোগী সত্য হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত নিচের আয়াতগুলো লক্ষণীয় :

*"হে মানুষ আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা এক অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। --- ।" (৪৯ :১৩)*

*"আর তাহার আয়াতের (নিদর্শনাবলীর) মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য*


www.nagorikpathagar.org

*অবশ্যয়ই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।" (৩০ :২২)*
*তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা হইতে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদগত করি, আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ, শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এইভাবে রঙ-বে রঙের মানুষ জন্তু ও আনআম রহিয়াছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাহাকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। যাহারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের তাহার ক্ষয় নাই। ( ৩৫ :২৭, ২৮, ২৯)*
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কি দুর্দান্ত বর্ণনা! কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের অধীনে ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকেই প্রতিটি জাতি, নৃতাত্বিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে এ থেকে স্পষ্ট বিধান আর হতে পারে!
কুরআনের আয়াতগুলো যদি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় তবে পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, উপদেশ-নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতসমূতের মাত্র কিছু আয়াত ব্যাতীত সবই মূল্যবোধ সংক্রান্ত। এই মূল্যবোধ প্রায় সকল সংস্কৃতিতে চর্চা করা যেতে পারে। একজন বিশ্বাসী তার চিন্তায় ও কর্মে এই মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাবেন এবং এর মাধ্যমেই 'ইসলাম ধর্ম-কর্ম'-এর প্রধান কাজটির চর্চা করবেন সম্ভবত সে নির্দেশই কুরআন দিচ্ছে। ইসলাম চর্চার বাকি অংশ এই মূল্যবোধ আত্মস্থ করা এবং চিন্তায় ও কর্মে তার প্রতিফলনের লক্ষ্যে মানসিক শক্তি বা দৃঢ়তা অর্জনের কর্ম বা প্রার্থনা।
আল্লাহ বলেন, তিনি মানুষকে চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় দিয়েছেন। মানুষ এই চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় ব্যবহার করে তার সাধারণ জ্ঞানে যা উত্তম তা গ্রহণ করছে কি না- সে বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর। আল্লাহ বলেন :
*"----- ; অন্তরে যাহা আছে, সে সম্মন্ধে আল্লাহ তো সবিশেষ অবহিত।" (৫ :৭)*
কুরআনের এই মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিষয় লক্ষণীয়। একজন মুত্তাকীর জন্য যে সব বিধান উপদেশ, আদেশ কুরআনে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তার মাত্র কয়েকটি বাকি সবই ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন মূল্যবোধ


www.nagorikpathagar.org

হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সকল সংস্কৃতিতেই বিশ্বব্যাপী সাবজনীন মূল্যবোধ হচ্ছে : যা 'উত্তম' গ্রহণ কর। কুরআনে ভালো-মন্দ সম্পর্কে যে আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশ এবং মুত্তাকি, সালাত ও দান-ইত্যাদি সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ব্যাখ্য দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাখ্যাই ইসলামের প্রকৃত রূপ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তবে স্থান, কাল, পাত্র, সংস্কার-সংস্কৃতি ভেদে বৈচিত্র্যময় বর্তমান পৃথিবীর সভ্য জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা 'অগ্রবর্তী অংশ'-এর মূল্যবোধের ধারণা এবং কুরআনের বর্ণিত মূল্যবোধের 'জ্ঞান' পরস্পরের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সামঞ্জস্যতা অংকের হিসেবে প্রকাশ করা হলে, প্রায় ৯৫ শতাংশ পবিত্র কুরআনের উপদেশের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ বিধান, আদেশ-উপদেশ হয়তো বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার অগ্রবর্তী অংশের মূল্যবোধে প্রশ্নবোধক হতে পারে। সে প্রশ্ন হয়তো এ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই। তবে পবিত্র কুরআন আরো কিছু মূল্যবোধ চর্চার জন্য মুত্তাকিদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যা ঐ সম্পর্কিত বর্তমান সার্বজনীন মূল্যবোধের মানদণ্ডে বহুগুণে উদার ও মহৎ। আধুনিক সভ্যতার অগ্রবর্তী অংশও এখনও ঐ মূল্যবোধের মানে পৌঁছাতে পারেনি। তবে কুরআন ও বর্তমান সভ্যতার সার্বজনীন মূল্যবোধের সামঞ্জস্যতার বিষয়টি লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তি যদি এই উপলদ্ধিতে পৌঁছান যে, আধুনিক সভ্যতার এই মূল্যবোধ সংক্রান্ত জ্ঞান মূলতঃ মানবজাতি জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতেই হোক কুরআন থেকেই গ্রহণ করেছে, তাহলে কোনভাবেই সে ধারণা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

ইসলাম ধর্ম সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট বিধানের অধীন এবং বিশ্বাসীদের কাছে ঐশ্বরিক। যেহেতু কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন করে কোন ঐশ্বরিক বিধান অবতীর্ণ হবে না সুতরাং যা আছে সেটিই আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা। কোন নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী, পরিবারের নিজস্ব 'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' বার তার কোন কোন অংশবিশেষ ইসলামের অংশ হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা না হলে তা নিশ্চিত আসলামের অং নয়। যেহেতু কুরআনে এমক কোন স্পষ্ট বিধান নেই, সুতরাং তা ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দাবি করা অথবা সে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য কুরআনের বিধানের ব্যখ্যাদানের উপাদান, উদাহরণ ও প্রমাণ-


www.nagorikpathagar.org

দলিল হিসেবে ব্যবহার করা আদৌ করআনের বিধানসম্মত কিনা– সে প্রশ্ন উত্থাপন অংসগত নয়।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন' তার অনুসরণের। 'কুরআনের' বহু আয়াতে 'আল্লাহর বিধান' ও 'ঐতিহ্য' প্রসঙ্গে বিশ্বাসীদের করণীয় নিয়ে উপদেশ আদেশ ও জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর স্পষ্ট বিধান কোনটি এবং কোনটি নয়, কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি নয়- সেসব সম্মন্ধে আল্লাহ বিশ্বাসীদের স্পষ্টভাবেই অবহিত করেছেন। কুরআনের আয়াতই ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত নির্দেশনা- কুরআন তা স্পষ্ট করেছে। ধর্ম-কর্ম এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পর্কিত এসব আয়াতে বিশ্বাসীদের জন্য স্পষ্ট আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশ রয়েছে তেমনি বিভিন্ন উদাহরণ, উপমা ও উপদেশের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আল্লাহ বিস্তারিতভাবে তাঁদের অবহিতও করেছেন।

আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেন, কে, কিভাবে, কি করছে বা পূর্বপুরুষরা কি করেছে তা আল্লাহর দৃষ্টিতে অসার। বিশ্বাসীদের মহাসাফল্য অর্জনে কুরআনে আয়াতের মাধ্যমে যে আদেশ-নির্দেশ উপদেশ দেওয়া হয়েছে একমাত্র সেটিই বিশ্বাসীদের জন্য অনুসরণীয় ও একমাত্র পথ। সুতরাং যে গ্রন্থ নিজেই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিচ্ছে, সে গ্রন্থের এই বর্ণনা অস্বীকার করে কোন এক সময়ে, কোন এক স্থানে কোন একটি গোত্র, সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কর্মকাণ্ডকে ইসলামী 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' হিসেবে দাবি যৌক্তিক কি-না সে প্রশ্ন উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা নয়। ইসলাম ধর্মের রূপরেখা ও কাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত একডেমিক বা অন্য সাধারণ আলোচনায় ইসলামের অংশ হিসেবে এসব উপাদান, উদাহরণ ও প্রমাণ-দলিল হিসেবে গণ্য করা সে আলোচনা বেবল বিভ্রান্তিই বাড়াতে পারে।

পবিত্র কুরআনই জানাচ্ছে, আল্লাহ যখনই তার বিধান সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা বা তা প্রচার করার জন্য কোন নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন, তখনই নবী ও রাসুলদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাফিররা নবী-রাসুল যা প্রচার করছেন তা প্রত্যাখ্যানে প্রধান যে যুক্তি দাঁড় করে তা হলো, আমরা আমাদের পূর্বপূরুষকে অনুসরণ করছি এবং পূর্বপুরুষকে এভাবে ধর্ম-কর্ম করতে দেখেছি। কাফিররা আরো বলে, আমাদের পূর্বপরুষকে যা করতে


www.nagorikpathagar.org

দেখেছি আমরা সেটিই করছি এবং আমরা তাদেরই অনুসরণ করব। কুরআন পাঠে লক্ষণীয় যে, নবী-রাসুল যাদের নবুওত সম্পর্কে আল্লাহর পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাফিররা এই একই যুক্তির প্রতিধ্বনি করেছে।

কুরআন নাজিলের দু-একশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পর থেকেই এই ১৪শ' বছর পর্যন্ত বিশ্বাসী হিসেবে দাবিদারদের একটি অংশ যখন কোন এক সময়ের কোন একটি স্থানের কোন একটি গোত্র, সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কর্মকাণ্ডকে ইসলামের অংশ হিসেবে দাবি করেন– তখন মনে হয় এ যেন কাফিরদের সেই কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। এইসব ব্যক্তিদেরকে যখন তাদের কোন কর্মের বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা নির্দ্বিধায় তার প্রতি অন্ধের মতো আচরণ করে বলেন, আমরা আমাদের 'মাযহাব' অনুসরণ করছি, সাহাবিদের আমলে এমন করা হতো, ইসলামী শাসকরা এটি করেছেন, আমাদের ইমাম এমনই বলেছেন, পীর, স্কলার এমনটিই করতে বলেছেন, আমাদের পিতা-প্রপিতামহ এভাবেই ইসলামী ধর্ম-কর্ম করতেন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরই অনুসরণ করছি। ইসলাম সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আলোচক-স্কলাররা সে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে কঠোরভাবে স্থির থাকার পরিবর্তে এইসব পূর্বপরুষদের কর্ম-কীর্তিকে ইসলামের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে আলোচনার প্রতিপাদ্যও করছেন!

আল্লাহ এ সম্পর্কে কি বলছেন ?

*"উহাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে, বরং 'আমরা আমাদের পিতৃপরুষদেরকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব'; শয়তান যদি উহাদিগকে জলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি?" (৩১ :২১)*

*"ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, তোমাদের পূর্বপরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চায়। ইহারা আরো বলে, ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছুই নহে এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু। আমি ইহাদিগকে পূর্বে কোন*


www.nagorikpathagar.org

*কিতাব দেই নাই যাহা ইহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই!' (৩৪ :৪৩, ৪৪)*

*"আমি কি উহাদের (মুহাম্মদ সঃ-এর সম্প্রদায় মক্কার মুশরিক-পূর্ববর্তী আয়াত দ্র :) কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে? বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদের মতাদর্শ অনুসরণ করিতেছি। এইভাবে তোমার (রাসুল সঃ-এর) পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলিত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের এবং আমরা তাহাদেরই মতাদর্শ অনুসরণ করিতেছি । সেই সতর্ককারী বলিত, তোমরা তোমাদের পূর্বপরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ আমি যদি তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি? তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি। (৪৩ :২২ এবং ২৩,২৪)একই অর্থবোধক আরো বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।*

উল্লেখিত আয়াতে পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন, কুরআনের আয়াতের মাধ্যমেই ধর্মকর্ম, ধর্মীয় সংস্কার, সংস্কৃতি ঐতিহ্য– ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করার জন্য আল্লাহ আদেশ-উপদেশ দিচ্ছেন। প্রচলিত ধর্ম-কর্ম, ধর্মীয় সংস্কার, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে কুরআনের আয়াত ব্যখ্যা করা বা কুরআনের আয়াতের যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন। বরং কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেই সে কষ্টিপাথরে প্রচলিত ধর্মকর্ম, ধর্মীয় সংস্কার, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের যথার্থতা যাচাই বাছাই করার নির্দেশ আল্লাহ জানাচ্ছেন। বিশ্বাসীদের এই প্রক্রিয়া অবলম্বন যথার্থভাবে করতে হলে প্রাথমিক কাজটি হবে বিশুদ্ধচিত্তে কুরআন বুঝে পাঠ করা। এবং সেই কাজটি সম্পন্ন করা হলেই কেবল একজন বিশ্বাসী সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তিনি যে ধর্ম-কর্ম করছেন তার কতটুকু তিনি পাল করবেন বা কতটুকু বর্জন করবেন তা যাচাই বাছাই– এ সক্ষম হতে পারেন।

শুধু বিশ্বাসীদের জন্যই নয়, তিনি বিশ্বাসী হন অথবা অবিশ্বাসীই হন–


www.nagorikpathagar.org

সমাজবিজ্ঞানী, স্কলার অথবা বর্তমান বিশ্ব সংকট প্রসঙ্গে গবেষক– যারাই ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা অথবা ইসলামের সরূপ সন্ধান বা ইসলামকে কেন্দ্র করে বর্তমান সংকট সম্পর্কে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান– তাদের সকলের জন্য কুরআনের বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তা করাটি যুক্তিসংগত।

শুধু সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, পারিবারিক ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে যারা ধর্ম-কর্ম করেন, কুরআন তাদের জন্য কি পথনির্দেশ দিচ্ছে?

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী অথবা অবিশ্বাসী মাতা-পিতার সন্তানই হোক, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মানুষকে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার, মমতা প্রদর্শন, তাদের সঙ্গে সর্বদা সম্মানসূচক কথা বলা, তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন :

*"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়ে তাহাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে উফ বলিও না এবং তাহাদের ধমক দিও না; তাহাদের সহিত সম্মানসূচক কথা বলিও। মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" (১৭ :২৩,২৪)*

*"আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভেধারণ করে। এবং তাহার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (৩১ :১৪)*

কিন্তু যখন পারিবারিক ঐতিহ্য বা সংস্কার অনুসরণের প্রশ্ন জড়িত আল্লাহ বলেন :

*"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদেরকে*


www.nagorikpathagar.org

*মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দেব তোমরা কী করিতেছিলে।" (২৯ :৮)*

*"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবেলায় কুফরিকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদেরকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে তাহারাই জালিম।" (৯ :২৩)*

*"তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সঙ্গে বসবাস করিবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট----- ।" (৩১ :১৫)*

সুতরাং পিতা-মাতা হোক, পরিবার হোক বা পূর্বপুরুষদেরই হোক- কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে হলে- তাকে পবিত্র কুরআনের উপদেশ ও আদেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী তিনি যে সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সংস্কারের ধারক হোন না কেন, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন' তার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা কুরআনের উপদেশ। কোন ব্যক্তি হয়তো মনে করছেন, তিনি ঐতিহ্যবাহী 'মুসলিম' পরিবারের সন্তান, তার পিতা-প্রপিতামহ যে ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসছেন, সেটিই প্রকৃত ইসলাম, আল্লাহর পথ– ফলে কুরআনের জ্ঞান অর্জন তার জন্য প্রয়োজন নেই এরং এ বিষয়ে তার পিতা-প্রপিতামহ অধিক জ্ঞানী সুতরাং কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তার ভুল হওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ চান প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজ নিজ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করুক। 'প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী' এ বার্তাটি আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহুবার পূনরাবৃত্তি করেছেন। পিতা-প্রপিতামহ আদৌ কুরআনের আলোকে নিশ্চিত সঠিক কাজটি করেছেন– এ নিশ্চয়তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিটি ব্যক্তির স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি ভেদে কর্মের ধরন পৃথক পৃথক হতে পারে এবং কোন বিষয় বোঝা বা হৃদয়াঙ্গম করার ক্ষমতাও সকলের এক নয়। সেই কোন ব্যক্তি অন্যকারো অনুসরণে কেবল তার বাহ্যিক দিকটি


www.nagorikpathagar.org

অনুসরণ করার সম্ভব কিন্তু হৃদয়ের কথা, উপলব্ধি বা অনুভূতি পরিপূর্ণভাবে অপরের কাছে পৌঁছান বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি কুরআন নিজভাষায় আদ্যপ্রান্ত বারবার বুঝে পাঠ করার পর আল্লাহ, কিয়ামত, রাসুল এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে তার যে জ্ঞান, অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে আর শুধুমাত্র কারো বাহ্যিক ইবাদত পদ্ধতি দেখে বা অনুররণ করে এবং কিছু কর্ম সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে কখনোই আল্লাহ, কিয়ামত, রাসুল এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে একই উপলব্ধিতে পৌঁছাবেন তা কি আদৌ সম্ভব?
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী কোন মুসলিম পরিবারের পিতা যিনি দীর্ঘদিন বুঝে কুরআন পাঠ করেন তিনি হয়তো তার সন্তানকে বললেন, 'বাবা, কখনোই শিরক করবে না, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে একমাত্র হৃদয়ের তাকওয়া। বিনয়ী ও ধৈর্যশীল ছাড়া কারো পক্ষে মহাসাফল্য অর্জন কঠিন।' সন্তান, যিনি পিতার পরামর্শ গ্রহণ করছেন, তিনি হয়তো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কিছু একটি বুঝলেন; কিন্তু কুরআন বারবার আদ্যোপ্রান্ত বুঝে পাঠ বা মনোযোগ সহকারে শোনা ছাড়া-তার পক্ষে 'হৃদয়ের তাকওয়া' সম্পর্কে প্রকৃত  ধারণা প্রাপ্তি অসম্ভব। বিশ্বাস, ধৈর্য, বিনয়, শিরক, জিহাদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কুরআন কাভার-টু-কাভার পাঠ অথবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ব্যতীত উপলব্ধি করা অসম্ভব। বরং এসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকাই অধিক।
'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফল বর্তমানে কি ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করেছে, সে উদাহরণ বর্তমান। একইভাবে 'হৃদয়ের তাকওয়া, বিশ্বাস, ধৈর্য, বিনয়, ইবাদত, আল্লাহর পথ, সরল পথ, শিরক, ক্ষমা, সালাত, সিয়াম, তিলওয়াত, কেরাত, কাফির, মুনাফিক, মুসলিম, মু'মিন, মুত্তাকি, কিতাবী, মুশরিক– ইত্যাদি 'শব্দ' সমূহের অর্থ ও এসব বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত ব্যখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতায় কোন ব্যক্তির ইবাদত ও কর্মের ফল স্রেফ আল্লাহর দেওয়া উপমা 'পাথরের ওপর ধূলিকণায় পরিণত হতে পারে যা সামান্য বৃষ্টিতেই ধুয়ে-মুছে যায়'।
আল্লাহ বলেন :
*"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে বাহির করিয়াছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন*


www.nagorikpathagar.org

*শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (১৬ :৭৮)*

*"--------; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় কোন কাজে আসে নাই; কেননা উহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল। --------।" (৪৬ :২৬)*

*"উহারাই (কাফির) তাহারা আল্লাহ যাহাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।" (১৬ :১০৮)*

*"এবং উহারা (কিয়ামতের পর দোজখের কাফিররা- ৬৭ :৭, ৮, ৯ আয়াত দ্রষ্টব্য) আরো বলিবে যদি আমরা শুনিতাম ( অবতীর্ণ উপদেশ, ৬৭ : ৯ দ্রষ্টব্য) অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে জাহান্নামবাসী হইতাম না।"*

সুতরাং পিতা-মাতা যে, সঠিকভাবে করেছেন, সে বিষয়টি নিজে যাচাই করার প্রাথমিক কাজটি হচ্ছে কুরআন পাঠ। পিতা-মাতা যেভাবে করেছেন আল্লাহ হয়তো সন্তানকে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন করতে পারেন। সুতরাং, কুরআন যথাযথভাবে পাঠ যদি তিনি নিজের ইবাদত পদ্ধতি বা আচার-আচরণ নিজে যাচাই করে সন্তুষ্ট থাকেন সে সিদ্ধান্ত তারই অথবা তিনি যদি খুঁজে পান যে তার ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ইবাদতে সমস্যা, কুরআনের উপদেশের পরিপন্থি, বিরোধপূর্ণ বা কুরআনের উপদেশ ও আদেশ-নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- তখন আল্লাহ প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে সেই ধর্মীয় আচার-আচরণ বা কর্ম বর্জন করার উপদেশই পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। এ কাজটি করতে হলে, সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসীকে মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন পাঠ অথবা কুরআন পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনে ও বুঝে সেখানে যেভাবে বলা হয়েছে– অথবা আয়াতের উপদেশ অনুযায়ী যেখানে সে সম্পর্কে মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তার চোখ, কান– সর্বোপরি জ্ঞান ব্যবহার করে তার নিজস্ব পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার জন্য যেটি উত্তম সে পথটিই বেছে নেবেন।

উপরের আয়াতসমূহ যে ব্যখ্যাটি দিচ্ছে তা আরো স্পষ্ট হতে পারে নিচের আয়াতটি যোগ করলে :

*"আমি মানুষকে তাহার মাতা পিতার প্রতি সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি।*


www.nagorikpathagar.org

*তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ৩০ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং ৪০ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক। তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম। এবং আমি অবশ্যয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।" (৪৬ : ১৫)*

লক্ষণীয় যে, ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের সন্তানদের একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে (একেশ্বরবাদী) মাতা-পিতার প্রতি অনুগত থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঐ বয়সসীমা অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র প্রকৃত বিশ্বাসীকে নিজেই আল্লাহর পথের সন্ধানে উদ্যোগী হতে হবে। এবং পবিত্র কুরানের বহু আয়াতের মমার্থ হলো, কুরআনে বর্ণিত পথই আল্লাহর পথ। কুরআনই এই পথনির্দেশ। কোন ব্যক্তির বয়স ৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র তিনি নিজ দায়িত্বে স্বয়ংসম্পন্নভাবে সে পথে অগ্রসর হবেন, সেই সাথে তিনি তার কুরআন থেকে তার অর্জিত জ্ঞান নিজ সন্তানদের অবহিত করবেন। সন্তানদের শিক্ষা প্রদান ও তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার দায়িত্বটিও তারই। একইভাবে যখন তার সন্তান ৪০ বছর বয়প্রাপ্ত হবেন– তিনিও যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হন– তবে তিনিও স্বয়ংসম্পন্নভাবে আল্লাহর অভিমুখী হবেন।

উপরে উল্লেখিত আয়াতটি সম্ভবত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বহন করছে। ইসলামের 'শাশ্বত পথ' প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কিভাবে অনুসারিত হবে সে দিক-নির্দেশনাও এই আয়াতের মাধ্যমে এসেছে। এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবার হিসেবে দাবিদার পরিবারে কোন পদ্ধতিতে সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে সে পদ্ধতিটিও কুরআন ব্যাখ্যা করেছে।

সেই সাথে যারা মুসলিম হিসেবে দাবিদার পরিবারের অংশ নয়, অবিশ্বাসী বা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী তাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলো উপরের আয়াতের সাথে যোগ করলে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা আরো


www.nagorikpathagar.org

স্পষ্ট হয়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য 'দায়িত্ব ও কর্তব্য' হিসেবে কুরআনের উপদেশ, বাণী বা আদেশ-নির্দেশ অবিশ্বাসী, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী বা যারা জানে না তাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রসঙ্গে কুরআনের বহু আয়াতের মধ্যে কয়েকটি :

*"উহাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাহাদের নয় যাহারা তাকওয়ায়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য যাহাতে উহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।" (৬ : ৬৯)*

*"যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা (কুরআন দ্বারা) তাহাদেরকে উপদেশ দাও যাহাতে তাহারা নিজ কৃতকর্মেও জন্য ধ্বংস না হয়।" ( ৬ :৭০)*

*"স্মরণ কর একদল বলিয়াছিল, আল্লাহ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিম্বা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাহাদিগকে সদুপোদেশ দাও কেন? তাহারা বলিয়াছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এ জন্য।" (৭ : ১৬৪)*

*"কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি নিশ্চয়ই উহাদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কানে বধিরতা দিয়াছি । তুমি উহাদেরকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।" (১৮ : ৫৭)*

*"মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নয়, উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে।" (৯ :১১২)*

*"এবং উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলওয়াত করা হইলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করিবে। যাহারা উহাদের নিকট আমার আয়াত তিলওয়াত করে তাহাদেরকে উহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, 'তবে কি আমি তোমাদেরকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ*


www.nagorikpathagar.org

*দেব? ইহা আগুন! এই বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদেরকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" ( ২২ :৭২)*

ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদান প্রসঙ্গে উপরের আয়াতের সাথে আরো কয়েকটি আয়াত যদি যোগ করা হয়, তবে এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট হতে পারে :

*"আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না, তাহা তো তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহর কাছে।" (৩৪ :৪৭)*

*"আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি। বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাই না, -------- ।"(২৫ :৫৬, ৫৭)*

*"বল, আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক।" (২৫ :৫৭)*

*"তুমি কি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহা তাহাদের কাছে দুর্বহ মনে হয়?" (৬৮ :৪৬)*

*"তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নয়। এবং তুমি তাহাদের নিকট ইহার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করিতেছ না। ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।" ( ১২ : ১০৩, ১০৪)*

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবার হিসেবে দাবিদাররা তাদের সন্তানদের কোন পদ্ধতিতে ধর্ম শিক্ষা দেবেন সে পদ্ধতিটিও যেমন ব্যাখ্যা করেছে একই সাথে যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে কিভাবে কুরআনের বাণী বা শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে বর্তমান মাদ্রাসা ব্যবস্থার শিক্ষা পদ্ধতি 'ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য' হিসেবে যে দাবি করা হচ্ছে সেটি আদৌ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কি-না সে প্রশ্ন উত্থাপনও অসংগত নয়।


www.nagorikpathagar.org

# ৩.৩ সাক্ষী ও সাক্ষ্য

আইনের দৃষ্টিতেই হোক অথবা কুরআনের দৃষ্টিতেই হোক কোন ঘটনা বা উক্তির সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনার সাথে জড়িত পক্ষ বা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণ। কোন ঘটনা বা উক্তির সত্যতা উদঘাটনে সে ঘটনা বা উক্তির সাথে জড়িত পক্ষগুলোর সাক্ষ্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাক্ষ্য যখন মতবিরোধ সৃষ্টি করে বা তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে তখনই প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান। ফলে এই প্রশ্নে কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সত্য গোপন অথবা অতিরঞ্জন করতে পারে। ঠিক একইভাবে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সে কাজটি করা অসম্ভব কিছু নয়। ফলে সত্য উদঘাটনে এক দিকে যেমন নিরেপেক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ অন্য দিকে অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ নথির সাহায্যে যুক্তির কষ্টিপাথরে সে সাক্ষ্য যাচাই-বাছাই-এর বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের মধ্যে একটি দল সত্য গোপন করে এটি সর্বজনবিদিত। কুরআনে বলা হচ্ছে :

*"আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। (৫০ঃ১৬)*

*"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।" (৬৪ :২)*

*"আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে; যেইভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিশয় ত্বরাপ্রিয়। (১৭ঃ১১)*

মানুষের মধ্যে একটি দল নিজ স্বার্থে যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে কুরআনের বহু আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে তা অবহিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে কয়েকটি :

*"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও*



www.nagorikpathagar.org

আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা মুমিন নয়। আল্লাহ এবং মুমিনগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা নিজেদেরকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।" (২ঃ ৮,৯)

"তাহারা বলে, আনুগত্য করি', অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল যাহা বলে তাহারই বিপরীত পরামর্শ করে.......... ।" (৪ :৮১)

"তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ কুফরি করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরি কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও।------ ।" (৪ঃ৮৯)

"যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?' আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তাহারা বলে 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?'--------- ।" (৪ঃ১৪১)

"দোটানায় দোদুল্যমান---না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে!----- " (৪ঃ১৪৩)

"--------, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়।------- ।" (৭ ঃ ১৭৬)

"..........; অতঃপর উহাদেরকে কিছু দেওয়া হইলে ইহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু উহাদেরকে না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।" (৯ঃ৫৮)

"..........- । তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক। যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও।-------- ।" (১৬ঃ৯২)

"তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।" (৪৭ঃ২২)

"ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, ইহা পাষাণ কিংবা তদাপেক্ষাও কঠিন। কিন্তু পাথরও এমন যে ইহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু এইরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়; আবার কিছু এমন


www.nagorikpathagar.org

*যে যাহা আল্লাহর ভয়ে ধসিয়া পড়ে। --------" (২ :৭৪)*

*"তাহাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্মন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা করে।" (২ঃ৭৮)*

*"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।---------" (২ঃ৭৯)*

*"এবং ইহারা বলে, 'আমরা কখনোই তোমাতে ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রসবণ উৎসারিত না করিবে, অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্রোধারায় প্রবাহিত করিয়া দেবে নদী।" (১৭ঃ৯১) ও (১৭ :৯২, ৯৩)*

*"মানুষ ধন সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না; কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;" (৪১ঃ৪৯)*

*"অতঃপর উহারা এক-অপরের প্রতি দোষারূপ করিতে লাগিল।" (৬৮ঃ৩০)*

*"বস্তুত মানুষ নিজের সম্মন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।" (৭৫ঃ ১৪-১৫)*

*"না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালোবাস;" (৭৫ঃ২০)*

*"বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।" (৯৬ঃ ৬, ৭)*

*"মানুষ অবশ্যয়ই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে অবশ্যয়ই এই বিষয়ে অবহিত এবং অবশ্যয়ই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।" (১০০ :৬,৭,৮)*

*"প্রাচূর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।" (১০২ঃ ১, ২)*

উপরোক্ত আয়াতসমূহে একশ্রেণীর মানুষের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কে সত্যবাদী অথবা কে মন্দ তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। কুরআনের বহু আয়াতে বহু মানুষের নাম উল্লেখ করে উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের এ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করে বিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, কোন মানুষের হৃদয়ে কি আছে সেটি তিনিই ভালো জানেন। এ সম্পর্কিতবহু আয়াতের মধ্যে একটি :

*"উহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা*


www.nagorikpathagar.org

*তোমার প্রতিপালক অবশ্যয়ই জানেন।" (২৭ঃ ৭৪)*

কুরআন এই মানুষের বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে সত্য যাচাই-এ যেমন চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় অর্থাৎ বিবেক, বুদ্ধি প্রয়োগের জন্য মু'মিনদের উপদেশ দিয়েছে তেমনি কোন ঘটনা বা উক্তির সত্যতা নির্ধারণে এং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ এড়াতে কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিস্তারিত উপদেশও প্রদান করেছে।

এই প্রক্রিয়ায় কুরআন এক দিকে লিখিত প্রমাণ সংরক্ষণ একই সঙ্গে সাক্ষীর নিয়োগ করার উপদেশ দিচ্ছে। এ লিখিত প্রমাণপত্র কিভাবে প্রস্তুত করা হবে, কারা সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবে, কিভাবে তারা নিয়োগ পাবে ও সাক্ষ্য প্রদান করবে তার সবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। সেই সথে ঘটনা ও উক্তির সত্যতা যাচাই-এর যুক্তি প্রমাণের ওপর দৃষ্টান্তও দিয়েছে।

*"হে মু'মিনগণ তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়, লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণ গ্রহীতা যেন সে লেখার বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে; আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গৃহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় এবং লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের ওপর তোমরা রাজি হইলে তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রী লোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে কেনা-বেচা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (২ : ২৮২)*


www.nagorikpathagar.org

*"হে মু'মিনগণ তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদের অপেক্ষমাণ রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না– যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করিব না; করিলে অবশ্যয়ই পাপিদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলাবর্তী হইবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যয়ই তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই– করিলে অবশ্যয়ই আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের------ ।" ( ৫ : ১০৬, ১০৭)*

*"উহাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদের রাখিয়া দেবে, না হয় উহাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন লোককে সাক্ষী রাখিবে। আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ------। (৬৫ঃ ২)*

*"তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যাভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে।--------। ----।" (৪ঃ ১৫)*

*"যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনো তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই সত্যত্যাগী।" (২৪ঃ ৪)*

*"তাহারা (কুৎসা রটনাকারী) কেন এই ব্যাপারে (রটনা) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহর নিকট মিথ্যেবাদী।" ( ২৪ঃ ১৩)*

*"এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে*


www.nagorikpathagar.org

*আল্লাহর নামে চারবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যয়ই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহর লানত। তবে স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে তাহার স্বামীই মিথ্যেবাদী এবং পঞ্চমবার বলে যে তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহর লানত।" ( ২৪ : ৬, ৭, ৮, ৯)*

উপরোক্ত আয়াতসমূহে খুবই স্পষ্টভাবে সত্য যাচাইয়ে যেমন নথির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একই সাথে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে বিশ্বস্ত ও সৎ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ঘটনার গুরুত্বের ওপর সাক্ষীর সংখ্যাও নির্ভর করছে। তবে যে কোন বিষয়ে ঘটনার সাথে জড়িত পক্ষ ছাড়া অন্তত দুইজন সাক্ষী রাখার উপদেশ লক্ষণীয়। কোন সাক্ষী সততা রক্ষা করতে না পারলে সেই সাক্ষীর পরিবর্তে নতুন সাক্ষী নিয়োগ দেওয়ার উপদেশও দেওয়া হচ্ছে। যে ক্ষেত্রে মতবিরোধে জড়িত পক্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কেউ নেই সেক্ষেত্রে মতবিরোধ নিরসনে ঘটনায় জড়িত উভয়পক্ষের দৃঢ় শপথের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও কুরআন ঘটনা বা উক্তির সত্যতা যাচাই– ঘটনাস্থলের অন্যান্য উপকরণ, কার্যকারণ ও যুক্তি ব্যবহারের উপদেশও প্রদান করেছে :

*"উহারা উভয়ে (ইউসুফ আঃ ও তার মনিবের স্ত্রী-) দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পেছন হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রী লোকটি বলিল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী হইতে পারে?'*

*ইউসুফ বলিল, 'সেই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল।'*

*স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী দিলো, 'যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রী লোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী; কিন্তু উহার জামা যদি পেছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।*

*গৃহস্বামী যখন দেখিল যে তাহার জামা পেছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো*


www.nagorikpathagar.org

*ভীষণ।" ( ১২ঃ ২৫, ২৬)*

সুতরাং কোন ঘটনা বা উক্তির সত্যতা যাচাই-এ কুরআন যে পদ্ধতি ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে :

১. নথি
২. সাক্ষী
৩. পরিস্থিতির কারণে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া না গেলে ঘটনায় জড়িতদের দৃঢ় শপথ
৪. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ
৫. যুক্তি

এবং এই পদ্ধতিতেই কেবল কুরআনের দৃষ্টিতে কোন ঘটনা বা উক্তির চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রমাণিত না হলেও কুরআনের ভাষায় : ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর।

কুরআন দাবি করে কুরআন নিরেট সত্য।

*"......সত্যা-সত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।......। -।"(২ :১৮৫)*

*'আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি.......' (৪ :১০৫)*

*'সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, ......'(৬ :১১৫)*

*...........। কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।' (৫৩ :২৮)*

সুতরাং কুরআনের কোন আয়াতের যে উপদেশ ও বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; কিন্তু তা আল্লাহর উপদেশ বিধান হিসেবে দাবি করা হচ্ছে এ ধরনের দাবির পক্ষে শত সাক্ষী হাজির করা হলেও তা গ্রহণ না করার জন্য আল্লাহ তার রাসুল (সঃ)-কে বিভিন্ন আয়াতে উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন :

*"বল,'আল্লাহ যে ইহা ( ৬ঃ ১৪৩ ও ১৪৪ আয়াত দেখুন-গবাদি পশু বণ্টন সক্রান্ত) নিষিদ্ধ করিয়াছেন- এ সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দেবে তাহাদেরকে হাজির কর।' তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সঙ্গে তাহা স্বীকার করিও না। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। (৬ :১৫০)*


www.nagorikpathagar.org

# ৪.১ হাদিস

আরাবি শব্দ 'হাদিস' বাংলায় সংবাদ, বাণী, কথা, বাক্য, ঘটনার বর্ণনা– ইত্যাদি অর্থবোধক। এই হাদিস শব্দটি পবিত্র কুরআনে বহুবার এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত কুরআনুল করিমে বিভিন্ন আয়াত ভেদে এই 'হাদিস' শব্দটির বাংলায় অনুবাদে 'বাণী', 'সংবাদ', 'কথা', বৃত্তান্ত এবং বাক্য -ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি হাদিস শব্দটির বিভিন্ন ইংরেজি সমার্থক শব্দ হিসেবে Narrations, Sayings, Words, Speech, Opinions, Statement, Utterance, Discourse, Account or Tale ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই হাদিস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনে উল্লেখিত হাদিস বা কুরআনের আয়াত যে হাদিস বহন করছে সেই হাদিস নির্দেশক হিসেবে। অর্থাৎ হাদিস অর্থে কুরআনের 'বাণী', 'সংবাদ', 'কথা' এবং বাক্য এবং ইংরেজিতে Narrations, Sayings, Words, Speech, Opinions, Statement, Utterance, Discourse, Account or Tale of Quraan- এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত :

"*তাহারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও, যে সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহারপর তাহারা আর কোন 'হাদিসে' (কথায়) ঈমান আনিবে ।" (৭ : ১৮৫)*

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অনূদিত কুরআনুল করিমে এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'কথা')

"*মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞানতা বশত আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার হাদিস (বাক্য) ক্রয় করিয়া নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ইহাদের জন্য রহিয়াছে অবমানকর শাস্তি। উহার নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখর সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া নেয় যেন সে উহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির, অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" (৩১ : ৬, ৭)*



www.nagorikpathagar.org

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'বাক্য')

*"আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম হাদিস (বাণী) সম্বলিত কিতাব, যাহা সুসামঞ্জস্য এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি এর মাধ্যমে যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।" (৩৯ :২৩)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'বাণী'।

*"এইগুলো আল্লাহর আয়াত যাহা আমি তোমার নিকট তিলওয়াত করিতেছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহর এবং তাহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন হাদিসে (বাণী) বিশ্বাস করিবে ?" (৪৫ :৬)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'বাণী'।

*"উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার (কুরআনের) সদৃশ কোন হাদিস (রচনা) উপস্থিত করুক না।" (৫২ :৩৪)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'রচনা'।

*"আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যয়ই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে- নিশ্চয়ই ইহা কুরআন- যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে যাহা পুত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ ইহা স্পর্শ করে না। ইহা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এই হাদিসকে (বাণীকে) তুচ্ছ গণ্য করিবে ? এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ।" (৫৬ : ৭৫-৮২)*

*"ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহারা এই (কুরআনের) হাদিসকে (বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে, আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ধরিব এমনভাবে যে উহারা জানিতেও পারিবে না।" (৬৮ :৪৪)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির


www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ করা হয়েছে 'বাণী'

*"সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন হাদিসে (কথায়) বিশ্বাস করিবে!' (৭৭ : ৫০)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই আয়াতে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরাবি 'হাদিস' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'কথা'।

*"তোমার নিকট কি পৌঁছাইয়াছে সৈন্যবাহিনীর হাদিস (বৃত্তান্ত) ফিরআ'ওন ও সামুদের।" (৮৫ : ১৭, ১৮)*

*"তোমার নিকট কি কিয়ামতের হাদিস (সংবাদ) আসিয়াছে ?"(৮৮ :১)*

সুতরাং সাধারণভাবে হাদিস শব্দটি উচ্চারণ করলে মু'মিন বা বিশ্বাসীদের নিকট যার অর্থ হওয়ার কথা ছিল কুরআনের বাণী, কথা ও বাক্য, সংবাদ ইত্যাদি। তবে প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য বর্তমানে দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, কালের বিবর্তনে আরাবি এই 'হাদিস' শব্দটি বাংলাদেশে তো বটেই সারা বিশ্বেই প্রায় সর্ব ভাষায় কুরআনের হাদিসের পরিবর্তে নবম শতাব্দি ও তার পরবর্তী সময়ে লিখিত বা সংকলিত কয়েকটি গ্রন্থের 'বাণী' নির্দেশ করছে। এই সব গ্রন্থের লেখক-সংকলকরা দাবি করছেন 'ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও কুরআনের সংকলক নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কুরআনের বাণী ব্যতীত তার জীবনের অন্য সকল কথা ও কর্মকাণ্ড, ঘটনা ইত্যাদির বর্ণনা সম্বলিত সংকলন। গত ১৩'শ বছরে এই 'হাদিসে রাসুল' বিশ্বব্যাপী এত ব্যপক পরিচিতি লাভ করেছে এবং তা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হিসেবে দাবিদার একশ্রেণীর মানুষের কাছে তা এতই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, হাদিস কুরআনের বাণী অর্থে বিশ্বাসীদের নিকট ব্যবহৃত হতো সে বিষয়টি বিলুপ্তি প্রায়।

বর্তমানে সাধারণভাবে বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই এই 'হাদিস' শব্দটি উচ্চারিত হোক না কেন- সে 'হাদিস' শব্দটি মূলত : ছয় ইমাম– ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আন নাসাফি, ইমাম আবু দাঊদ, ইমাম আল তিরমিজি এবং ইবনে মাযাহ কর্তৃক তাদের ভাষায় নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা ও কাজসমূহ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরিফ, প্রথম খণ্ড ভূমিকায় (২১ ও ২২ পৃষ্ঠা) বলা হয়েছে : আখেরি নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁরই প্রতি নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ


www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন; কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসুলল্লাহ (সঃ)-এর ওপর। তিনি নিজের কথা,কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন।'

বুখারী শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়, 'ইলমে হাদিস এমন বিশেষ জ্ঞান যার সাহায্যে নবী (সঃ) এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়।

আর ফিকহবিদদের নিকট হাদিস হলো, 'আল্লাহর রাসুলের কথা ও কাজসমূহ। আবার কারো মতে, হাদিস এমন একটি বিষয় যা রাসুল (সঃ) এর বাণী, কর্ম ও নীরবতা এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈনদের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরিফ, প্রথম খণ্ড ভূমিকায় বর্ণিত একটি উক্তিও লক্ষণীয় : 'কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ট, সর্বোত্তম এবং তথ্য সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদিস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং হুকুম আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।' একই গ্রন্থে বলা হয়, 'হাদিসের অপর নাম সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি।'

নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর ওফাতের প্রায় ২৪০ বছর পর সে সময়ে আরবে প্রচলিত নবী মুহাম্মাদ সঃ-এর দৈনন্দিন জীবন-যাপন, ইবাদত, কর্ম, বক্তব্য, উক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মৌখিক বর্ণনাসমূহ ছয় ইমাম পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ পন্থা অনুসরণ করে সংগ্রহ করেন এবং তাদের সংগৃহীত বর্ণনাগুলো তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বাছাই করে তাদের দৃষ্টিতে 'সহি' এই ছয়টি পৃথক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় বিষয় এই ছয়টি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ এই ছয়টি স্বীকৃত গ্রন্থের প্রকাশনাকাল কাছাকাছি অর্থাৎ পরবর্তী ৪৫ বছরের মধ্যে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথমটি 'সহি আল বুখারী' সংকলিত হয় নবী মুহাম্মাদ সঃ-এর ওফাতের প্রায় ২৪০ বছর পরে। সহি আল বুখারী প্রকাশিত হওয়ার ৫ বছরের পর 'সহি মুসলিম', ১৭ বছর পর 'সহি সুনান ইবনে মাযাহ', ১৮ বছরের পর সুনান আবু দাউদ, ২২ বছরের পর জামি আত তিরমিজি এবং ৩৫ বছর পর সুনান নাসা'জ সংকলিত হয়।


www.nagorikpathagar.org

**ইমাম বুখারী**

বুখারী শরিফ : আল-জামি আল-সাহিহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসুলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি

জন্ম : ৮১০ খ্রিস্টাব্দ, খোরাসানের বুখারাতে

মৃত্যু : ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

তার বাবার নাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ছিলেন একজন হাদিসবিদ। তিনি হাদিস শাস্ত্রবিদ আল্লামা হাম্মাদ (রহঃ) এবং হজরত ইমাম মালেক (রহঃ) এর শাগরিদ ছিলেন। বলা হয়, ১০ বছর বয়স থেকে তিনি হাদিস মুখস্থ করা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি 'আবদুল্লাহ বিন মুবারক' এবং 'ওয়াকীর পাণ্ডুলিপিসমূহ' মুখস্থ করে ফেলেন।

ইমাম বুখারী রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি। এগুলোর কিছু বিলুপ্ত হয়েছে গেছে। আর কিছু গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হলো বুখারী শরিফ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো : ৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থের সংকলন শুরু করেন। ১৬ বছর পর ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এর সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

৬ লাখ হাদিস হতে যাচাই বাছাই করে সর্বসাকুল্যে সাত হাজার একশত পঁচাত্তর (৭,১৭৫) হাদিস তার গ্রন্থে সংকলন করেন। আর পুনরোক্ত ছাড়া আছে চার হাজারের (৪,০০০) মতো।

তিনি ২৫৬ হিজরির, ১লা শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে আগস্ট, ৮৭০ খ্রিস্টাব্দের শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

**মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ**

সহিহ মুসলিম শরিফ

জন্ম : ৮১৫ থেকে ৮১৯ খ্রিস্টাব্দ, নিশাপুর, খোরাসান, ইরান

মৃত্যু : ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ

তার সম্পর্কে বলা হয়, শৈশবকাল হতেই তিনি হাদিস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদিস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সবগুলো কেন্দ্রেই গমন করেন । বিশেষত ঃ ইরাক, হিজাজ, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে তথায় অবস্থানকারী হাদিসের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদিস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন । তিনি এ সকল স্থানের ইমাম বুখারী


www.nagorikpathagar.org

এবং অন্যদের নিকট থেকেও হাদিস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন । কথিত আছে, এই শহরে এক সময় ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারণা শুরু হয় । ইমাম মুসলিম তখন বুখারীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

**ইমাম মুসলিম রচিত গ্রন্থসমূহ :** তাঁর হাদিস সংকলণ 'আস-সাহিহ' ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়ঃ-

আল-মুসনাদ আল-কাবীর, কিতাব আল-জামি 'আলা আল-আবওয়াব, কিতাব আল-আসমা' ওয়া আল-কুনা, কিতাব আল-তাময়ীয, কিতাব আল-ইফরাদ, কিতাব আল-আকরান ইত্যাদি।

তিনি সাহাবিদের জীবনী বিষয়ক "আল-মুসনাদ আল-কাবীর" রচনায় হাত দিলেও তা শেষ করে যেতে পারেননি । একমাত্র 'আস-সাহিহ' ছাড়া তাঁর রচনার আর কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না।

ইমাম মুসলিম ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সনে ইন্তেকাল করেন ।

## ইমাম আবু দাউদ

সুনানে আবু দাউদ

জন্ম : ইরানের সিস্তানে, জন্ম তারিখ অজানা

মৃত্য : ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বসরায়

তিনি মূলত ফিকহ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে তিনি হাদিস সংগ্রহে মনোযোগী হন। কথিত আছে তিনি প্রায় ৫,০০,০০০ হাদিসের মধ্যে প্রায় ৪,৮০০ হাদিস তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ হানবালি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

তিনি সর্বমোট ২১টি বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো : সুনানে আবু দাউদ। এটি তার প্রধান কর্ম।

অন্যান্য গ্রন্থ : আল-জামি আল মুখতাসার মিন আস-সুনান আন-রাসুলিল্লাহ

## মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি

আত-তিরমিজি

জন্ম : ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ।

মৃত্যু : ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ

আত-তিরমিজির নাম ছিল 'মুহাম্মাদ'। আবু ঈসা ('ঈসার বাবা') ছিল তার


www.nagorikpathagar.org

কুনিয়াত। তার বংশলতিকা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

তিনি তার লকব 'আদ-দাহহাক' ('অন্ধ') বলেও পরিচিত ছিলেন। বলা হয় যে তিনি জন্মের সময় অন্ধ ছিলেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত যে তিনি তার জীবনের শেষের দিকে অন্ধ হয়ে যান।

আত-তিরমিজি ২০ বছর বয়সে হাদিস অধ্যয়ন শুরু করেন। ৮৪৯/৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি খোরাসান, ইরাক ও হেজাজ সফর করেছেন। শিক্ষক ও যাদের কাছ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : ইমাম বুখারী, আবু রাজা উতাইবা ইবনে সাইদ আল-বালখি আল-বাগলানি। আত-তিরমিজি ইমাম বুখারীর ছাত্র ছিলেন।

তার গ্রন্থসমূহ : আল-জামি আল মুখতাসার মিন আস-সুনান আন-রাসুলিল্লাহ, এটি জামি আত-তিরমিজি নামে পরিচিত। অন্যান্য গ্রন্থ : আল-ইলাল আস-সুগরা; আজ-জুহদ; আল-ইলাল আল-কুবরা; ইত্যাদি

আয-যাহাবির মতানুযায়ী আত-তিরমিজি তার জীবনের শেষ দুই বছর অন্ধ অবস্থায় কাটান। ইমাম তিরমিজি ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ, বুগে ইন্তেকাল করেন।

## ইমাম ইবনে মাজাহ

সুনান-এ-ইবনে মাজাহ

জন্ম : ৮২৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ

সুনান-এ-ইবনে মাজাহ হাদিস বিষয়ক প্রধান ছয়টি গ্রন্থের বা সিহাহ সিত্তাহ-এর একটি, যা ইমাম ইবনে মাজাহ কর্তৃক সংকলিত।

এই গ্রন্থে ৪,০০০ টি হাদিস রয়েছে যা ৩২ টি খণ্ডে ১,৫০০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। সুন্নি মতানুসারে এই গ্রন্থটি হাদিস বিষয়ক প্রধান ছয়টি গ্রন্থের একটি

## ইবনে আলি আল খোরাসানি আন-নাসাই

সুনানে নাসাই

জন্ম : ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাসা শহরে

মৃত্যু : ৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮৮ বছর

ইবনে আলি আল খোরাসানি আন-নাসাই-এর গ্রন্থ সুনানে নাসাই। এই গ্রন্থে


www.nagorikpathagar.org

মোট হাদিসের সংখ্যা ৫৭৬১ টি।

উল্লেখিত ছয়টি গ্রন্থ সিয়াহ সিত্তাহ-এ ছয় প্রণেতা ছাড়াও আরো বহু ইমাম হাদিস সংগ্রহ ও শিক্ষা প্রদান করতেন। তাদের মধ্যে আছেন, ফিকহ্ ও হাদিস বিশারদ আহমদ বিন হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) যিনি ইসলামের প্রচলিত চার মাযহাবের একটি হাম্বলী মাযহাব তার দিকেই সম্পৃক্ত। ইমাম আহমদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থ মুসনাদকে তাঁর বিখ্যাত কীর্তি মনে করা হয়।

**নোমান ইবনে সাবিত বা ইমাম আবু হানিফা**

জন্ম : ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ, ৬৭ বছর

নোমান ইবনে সাবিত মূলত : ইমাম আবু হানিফা নামেই অত্যধিক পরিচিত। ছিলেন ফিকহশাস্ত্রবিদ

ইসলামী ফিকহের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত চারটি সুন্নি মাযহাবের একটি "হানাফি মাযহাব"-এর প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

**আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবন ইবরাহিম আল-ওয়ারিজলানি,** তার গ্রন্থের নাম আল-জামি আল-সহিহ বা মুসনাদ আল-রাবি ইবন হাবিব

এছাড়াও হাদিস সংকলনে শিয়া মতালম্বী ইমামদেরও একটি বড় দল রয়েছেন। মূলত রাসুল (সঃ) ওফাতের দিবস থেকেই হাদিসের আবির্ভাব শুরু হয়। যদিও তখন এই বিষয়টির নামকরণ 'হাদিস' বলা হয়নি, কিন্তু এ সময় রাসুল (সঃ) স্থলে মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান কে হবেন তা নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন মু'মিনদের মধ্যেই একটি অংশ এই রাসুল (সঃ) কৃত বিভিন্ন বাণী সংকট উত্তরণে সামনে নিয়ে আসেন। এ প্রেক্ষিতে এই হাদিস নিয়ে দু-পক্ষে ভাগ হয়ে একদল আলী (রাঃ)-কে রাসুল (সঃ)-এর উত্তরাধিকার দাবি করে। আরেকটি দল ঠিক একই ভাবে রাসুল (সঃ) কয়েকটি বাণী হাজির করে আবু বকর (রাঃ)-কে ক্ষমতার উত্তরাধিকার দাবি করে।

দু'পক্ষের দাবির পেছনে যে দুটি হাদিস প্রধানত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তা নিম্নরূপ :

ইবনে ইসহাকের বর্ণিত ইতিহাস অনুযায়ী, রাসুল (সঃ)- এর ওফাতের পর রাসুল (সঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত একটি হাদিসকে কেন্দ্র করে। রাসুল (সঃ)-এর উত্তরাধিকার কে হবেন, এ প্রশ্নে যখন নবী (সঃ)-


www.nagorikpathagar.org

এর ঘনিষ্ঠ অনুসারী নেতৃস্থানীয়দের বিভিন্নজনকে নিয়ে কথা হচ্ছে, ঠিক সময়ে একদল অনুসারী হজরত আলীর পক্ষ্যে একটি হাদিস সামনে নিয়ে আসে। যদিও হজরত আলীসহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণ এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ তো দূরের কথা তিনি এ সম্পর্কে ছিলেন একবারেই নির্লিপ্ত।

ইবনে ইসহাক ও আল-তাবারির ইহিতাস গ্রন্থে বলা হয়, মুহাম্মাদ (সঃ) মক্কায় আখেরি হজ পালন শেষে মদিনায় ফেরার পথে এক রাতে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী পানির উৎস 'গাধির খুম' এলাকায় তাঁবু ফেলেন। ঠিক একই সময় আলী (রাঃ) ইয়েমেন বিজয় শেষে মদিনায় ফিরছিলেন এবং এই 'গাধির ধুম'-এ মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হলে সেখানে সে রাতে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এশার নামাজের পর মুহাম্মাদ (সঃ) তার নিকট আত্মীয় ও জামাতা এবং মক্কার প্রথমপর্ব ইসলাম প্রচারের সময় থেকে রাসুল (সঃ) এর একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্য ও প্রতিটি যুদ্ধের সাথী হজরত আলীকে ডেকে তার নিজের একপাশে দাঁড় করান। এরই এক পর্যায়ে তিনি হজরত আলীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বলেন, 'আমি আমার যে মহান প্রভুর বান্দা, আমার মতোই আলীও সেই প্রভুর বান্দা। যারা তার (আলী রাঃ) বন্ধু, তারা আল্লাহর বন্ধু, যারা তার (আলী রাঃ) শত্রু, তারা আল্লাহর শত্রু।

এই ভাষণের পর মদিনায় ফিরেই রাসুল (সঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন এই অসুস্থতা বাড়তে থাকে। সে অসুস্থতা থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠেন নি। ঐ ঘটনার তিন মাসের মধ্যে রাসুল (সঃ) মৃত্যুবরণ করেন। একই সময়ে রাসুল (সঃ)- র স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বেশ কিছু লোকজনকে ডেকে বলেন, তার পিতাই রাসুল (সঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকার। রাসুল (সঃ)-এর আরেক স্ত্রী হজরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা (রাঃ) তার পিতার পক্ষে অবস্থান নেন।

তবে সিয়াহ সিত্তাহে সংকলিত হাদিসে গাধির ধুম -এ রাসুল (সঃ)-এর ভাষণ সংক্রান্ত কোন হাদিস স্থান না পেলেও প্রায় একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি ভাষনের উল্লেখ করে একটি হাদিস সহিহ হাদিস হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই হাদিসটি নিম্নরূপ :

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন : খায়বারের যুদ্ধের দিনের ঘটনার উল্লেখ করে রাসুল বলেন, এমন একজনের হাতে আমি পতাকা তুলে দেবো যে


www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তার রাসুল তাকে ভালোবাসেন। বিজয় অর্জিত হওয়ার পর রাসুল আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) তাদের দুই পুত্র হাসান ও হোসেনকে ডাকলেন এবং আলী (রাঃ) হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বলেন, এরাই আমার পরিবার। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত মুসলিম শরিফ- পঞ্চম খণ্ড, ৬০০২ নম্বর হাদিস)

আলী (রাঃ) পক্ষে এই হাদিস টেনে আনার পর একইভাবে আলী (রাঃ) বিরোধী পক্ষ রাসুল (সঃ) এর স্ত্রী হজরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশা (রাঃ) তার পিতার পক্ষে একটি হাদিস নিয়ে হাজির হন। তিনি যে হাদিসটি নিয়ে তার পিতার পক্ষ অবলম্বন করেন তা হলো :

"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তার রোগ শয্যায় বললেন, তোমার আব্বা ও ভাইকে ডেকে আন। আমি একটি পত্র লিখে দিই। কেন না আমি ভয় করছি যে, কোন বাসনা পোষণকারী বাসনা করবে আর কেউ বলবে আমিই অগ্রাধিকারী (অধিক যোগ্য)। অথচ আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও (অস্বীকার করে)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত মুসলিম শরিফ- পঞ্চম খণ্ড, ৫,৯৬৫ নম্বর হাদিস)

'মুসলিম শরিফ- পঞ্চম খণ্ড, ৫৯৫৪ নম্বর হাদিসেও রাসুল (সঃ)- এর ভাষণের উল্লেখ করে আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন : মমসজিদে যেন কারো খিড়কি দরজা না থাকে শুধু আবু বকরের ছোট দরজা ব্যতীত।'

যেহতু সে সময়ে রাসুল (সঃ) -এর দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, রাসুল (সঃ)-এর ঘনিষ্ঠ এবং মুমিনদের মধ্যে প্রভাবশালী অনুসারীরা সবাই জীবিত ছিলেন-ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তারা কুরআন ও ইসলামের প্রকৃত আদর্শে ছিলেন অবিচল। এই হাদিস পাল্টা হাদিস নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দুটি পক্ষের কিছু লোক উসকানি দিলেও আবু বকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-কেউই এই দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িত করেন নি। তারা হাদিসের সত্য-মিথ্যা যাচাই-এর পরিবর্তে কুরআনের বাণী অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে পরামর্শ সভায় বসেন। খুবই স্বাভাবিক যে তারা এই পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের উপদেশকেই অনুসরণ করার পথ বেছে নেন। এই পরামর্শ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে হজরত আবু বকর


www.nagorikpathagar.org

(রাঃ)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দিতে আরও চারজন খলিফা এই নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত হন।

তবে এই দুই হাদিসের পক্ষের বিরোধের আপাত : অবসান ঘটলেও পরবর্তীতে হজরত আলীর পক্ষে একদল ও আয়েশা (রাঃ)-এর পক্ষে হাদিসকে কেন্দ্র করে দুই দল হয়ে মুসলিম হিসেবে দাবিদাদের বিভেদ এতই তীব্র করে তুলল যে ইসলামে প্রথম প্রকাশ্য দুটি অংশ 'শিয়া ও সুন্নিতে' বিভক্তি সৃষ্টি হলো। যে বিভেদ আজও তেমনি তীব্র।

সে সময়ের আরবের রাজনৈতিক ইতিহাস ও হাদিসের ইতিহাস পাশাপাশি পাঠ করলে একটি বিষয় যে কোন পাঠকের জন্য লক্ষণীয়, যে মদিনার প্রথম যুগের খলিফাদের শাসনামলে হাদিসের ব্যবহার এক রকম নিষিদ্ধই ছিল, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দল এই হাদিস উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করেছে। এমনকি খলিফাদের বিরুদ্ধেও উসকানি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। বিষয়টির একটির সূত্র পাওয়া যায় সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরাইয়া বর্ণিত একটি হাদিসে।

"আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : 'আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে ইলমের দু'টি পাত্র মুখস্ত করে রেখেছিলাম। এর একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী (অথবা খাদ্যনালী) কেটে দেওয়া হবে।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত বুখারী শরিফ প্রথম খণ্ড : ১২০ নম্বর হাদিস)

এই হাদিস যদি সত্য হয়ে থাকে এবং সেটি যদি আবু হুরাইরার উক্তিই হয় তবে এ প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এক. কারা কেন আবু হুরাইরাকে রাসুল (সঃ)-এর হাদিস বলার অপরাধে হত্যা করত? দুই. কি ছিল সেই অন্তত আরো পাঁচ হাজার বাণীতে এবং তিন. আবু হুরাইরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন কোন দিক এই উক্তিতে উন্মোচিত হচ্ছে?

কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার শেষের দিকের সুরা মুহাম্মাদ, মুনাফিকুন, হুজরাত ও তওবাসহ বিভিন্ন সুরার আয়াতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, মুনাফিকরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্য ক্রমবর্ধমান বিরোধিশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। রাসুল (সঃ)এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে পবিত্র কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে এই মুনাফিকদের মনোভাব, রাসুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্র


www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে এবং এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসুল (সঃ)-এর কর্মকৌশল কি হবে সে বিষয়ে রাসুল (সঃ)-কে অবহিত করা হয়।

কুরআনের আয়াতই প্রমাণ করছে, মক্কা বিজয় পরবর্তীতে ইসলাম ও রাসুলের জন্য মুশরিক ও কিতাবীরা যতটা না হুমকি ছিল তার চেয়ে বহু গুণে বেশি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ শত্রুরা। স্বয়ং রাসুল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন তার জীবিত অবস্থায় মুনাফিকরা ইসলামের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে, রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর এই ধারা আরো কত বেশি শক্তিশালী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। খুব সহজেই ধারণা করা যায়, মুহাম্মাদ (সঃ) এর মৃত্যুর পর তারা আরো বহুগুণে শক্তিশালী হয়েছে। নবী (সঃ) নেই সুতরাং হাদিসের সুযোগটি তারা ব্যবহার করবে খুব স্বাভাবিক। এই ধারা পরবর্তীতে আরো বহুগুণ শক্তি অর্জন করে। সে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামের চার খলিফার শাসনামলে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা, ষড়যন্ত্র এবং সেসব ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে। রাসুল (সঃ)-এর মক্কা জীবন থেকে একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্য, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং প্রতিটি বিপদ-আপদ, যুদ্ধের সাথী হজরত ওমর (রাঃ) ও হজরত ওসমান (রাঃ) এবং হজরত আলী ও তার পুত্রদ্বয় নিহত হন। এসময় নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধে আরো বহু ঘনিষ্ঠ সাহাবিও নিহত হন। যেহেতু বিভেদের শুরুটা হাদিস দিয়ে সুতরাং ধরে নেওয়া যায় পরস্পর বিরোধী হাদিস এই দ্বন্দ্বে কোন কোন পক্ষের দলভারীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসুল (সঃ) -এর ঘনিষ্ঠ, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত এবং মুমিনদের মধ্যে প্রভাবশালী শীর্ষস্থানীয় অনুসারীরা কুরআনের উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি গ্রহণ করলে তাদের সময় থেকেই কিছু কিছু অনুসারী অনেকটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের চোখের আড়ালে গোপনে এই 'হাদিস' সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু হয়। এসব হাদিস খলিফাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ সংক্রান্ত পরবর্তী ইতিহাস লক্ষ্য করলে সহজেই দৃশ্যমান হয় যে, এই 'হাদিস'-এর যত সম্প্রসারণ ঘটেছে– ইসলামের নামে দ্বন্দ্ব-বিভেদ তত বেড়েছে।


www.nagorikpathagar.org

# ৪.২ হাদিস যাচাই-বাছাই

ইতিহাস পদ্ধতির আলোকে বা কুরআনের বর্ণিত সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতির আলোকে ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের এই গ্রন্থেও ইতিহাস পরিচ্ছদে হাদিসের সত্যতা যাচাই ও গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এ প্রশ্নে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তবে ঐ ধারণার সাথে যদি হাদিস সংগ্রহে ও সংকলনে যে পদ্ধতি ও নীতিমালা এবং সিয়াহ সিত্তায় সংকলিত হাদিসের সত্যতা প্রশ্নে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যায় তবে এই হাদিসের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে।

**হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি :** হাদিসবেত্তাগণ সাহাবির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, বা তাকে দেখেছেন, ও তার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে এবার তাকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূল্লাহ (সঃ) এর সাহাবি বলা হয়।

**তাবিঈ** : তাবিঈ -এর সঙ্গা নির্ধারণ করা হয়েছে : যিনি রাসুলুল্লাহ-এর কোন সাহাবির নিকট হাদিস শিক্ষালাভ করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবিঈ বলা হয়।

সনদ : হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলা হয়।

মুত্তাসিল : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তালি হাদিস বলা হয়।

সাহিহ হাদিস : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাতগুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত তাকে সহিহ হাদিস বলা হয়।

লক্ষণীয় যে : উপরের হাদিসের যাচাই-এ কুরআনেরর উপদেশের আলোকে



www.nagorikpathagar.org

কোন পদ্ধতি গ্রহণের পরিবর্তে হাদিস সংগ্রকারীরা নিজেদের মতো করে 'সনদ' এর পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ, ওসিওয়াতের মতো সাধারণ দৈনন্দিন পার্থিব বিষয়ে বিরোধে সত্যা-সত্য যাচাই-এ যেখানে অন্তত : দুইজন সাক্ষী, লিখিত নথি ও সাক্ষীর ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাগুণ এবং আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী হাজির করার কথা বলা হচ্ছে (দেখুন এই গ্রন্থের সাক্ষী ও সাক্ষ্য পরিচ্ছদ এ), সেখানে রাসুল (সঃ)- উক্তি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যার ওপর কোন ব্যক্তির বিচার দিবসে মহাসাফল্য নির্ভর করছে– সে বিষয়ে সাক্ষ্যের সত্যতা যাচাই কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। দ্বিতীয়ত : কোন ব্যক্তি ঈমানদার কি ঈমানদার নয় সেটি– তার হৃদয়ের বিষয়। এ বিষয়ে কেবলমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তাদের অন্তর এক আর বাইরের কর্মকাণ্ড ভিন্ন। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ঈমানদার নির্ধারণ প্রকৃত ঈমানদারদের বিভ্রান্ত করার জন্য মুনাফিকদের সহজ সুযোগ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করেছে।

আল্লাহ মানুষের ছলনা-প্রতারণার বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের বহু বর্ণনা ও উদাহরণ কুরআনে দিয়েছেন, মুনাফিকদের উদাহরণও দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন নবীর সময়ের এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় এমন বর্ণনা ও উদাহরণ দেওযা হয়েছে, শয়তান ও মানুষ সম্পর্কে মু'মিনদের সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ হিসেবে। এ সম্পর্কিত বেশ কযেকটি আয়াত এই গ্রন্থেও সাক্ষী ও সাক্ষ্য পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসা (আঃ)-এর একজন কথিত সাহাবির ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার ভাই ও নবী হারুন (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে রেখে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে গমন করেন। মুসা (আঃ)-এর মাত্র এই চল্লিশ দিনের অবর্তমানে এবং একজন নবী তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও তারই এক সঙ্গী সামিরী কিভাবে মুসা (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে তারই বিবরণ আল্লাহ এই বর্ণনাতে তুলে


www.nagorikpathagar.org

ধরেছেন। মুসা আঃ যখন তূর পর্বতে পৌঁছান প্রথমেই এই সংবাদিটি আল্লাহ তার নবীকে অবহিত করেন এভাবে :

*"হে মুসা ! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে*

*সে বলিল, 'এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এ জন্য।'*

*তিনি বলিলেন, 'আমি তো তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামিরী উহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'*

*অতঃপর মুসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে?*

*উহারা বলিল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই, তবে আমাদের ওপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। অতঃপর সে উহাদের দ্বারা গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা হাম্বা হাম্বা রব করিত।'*

*সামিরী বলিল, 'ইহা তোমাদের ইলাহ এবং মুসারও ইলাহ; কিন্তু মুসা ভুলিয়া গিয়াছে।'*

*তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে উহা উহাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না?*

*হারুন উহাদের পূর্বেই বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। ইহা (এই ঘটনা) দ্বারা তো কেবল তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল।'*

*উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের নিকট মুসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।'*


www.nagorikpathagar.org

*মুসা বলিল, হে হারুন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?*

*হারুন বলিল, 'হে আমার সহোদর, আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভিদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।'*

*মুসা বলিল, 'হে সামিরী ! তোমার খবর কী?*

*সে বলিল, 'আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই, অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; আমার মন আমার জন্য এইরূপ করা শোভন করিয়াছিল।'*

*মুসা বলিল, 'দূর হও; তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে তুমি অস্পৃশ্য', এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় সাজার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহর প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই।'*

*তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তাহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।" (২০ : ৮৩-৯৮)*

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সামিরীর বিশদ পরিচয় উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঘটনার বর্ণনায় স্পষ্ট যে, সামিরীনামক ব্যক্তিটি মুসা (আঃ)-এর ঘনিষ্ঠ ও তারই দলের নেতৃস্থানীয় সঙ্গীদেরই একজন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উপরের উদাহরণ মু'মিনদের শিক্ষণীয় হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুসা (আঃ) স্বয়ং জীবিত। তিনি মাত্র ৪০ দিনের জন্য তার সম্প্রদায়কে রেখে সফরে গেছেন। তার সম্প্রদায়ের সাথে তারই ছোট ভাই একজন নবী বর্তমান। সেই অবস্থায় তারই একজন সঙ্গী মুসা আঃ সম্পর্কে অসত্য কথা বলে তার সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালিত যখন করতে পারে তখন মানুষ সম্পর্কে একজস মু'মিনের কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তা সহজেই অনুমেয়।

পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার বর্ণনার মধ্যে যে মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার অনুসারীদের জন্য যে উপদেশ রয়েছে তা এই ঘটনা উল্লেখের পরের


www.nagorikpathagar.org

আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন :

*"পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ এইভাবে তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ, ইহা হইতে যে মুখ ফিরায় সে অবশ্যয়ই কিয়ামতের দিনে মহাভার বহন করিবে। উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা উহাদের জন্য হইবে কত মন্দ!" (২০ : ৯৯-১০১)*

আল্লাহ আরো বলেন :

*"উহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহার পর উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়। বস্তুত উহারা মু'মিন নয়। এবং যখন উহাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়। আর যদি উহাদের প্রাপ্য থাকে তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রাসুলের নিকট ছুটিয়া আসে।" ( ২৪ :৪৭,৪৮, ৪৯)*

*"আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রীর ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎ কর্মপরায়ন বান্দার অধীনে। কিন্তু ইহারা তাহাদেও প্রতি বিশ্বাষঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লুত উহাদিগকে আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ কর।'*

*আল্লাহ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল : 'হে আমার প্রতিপালক তোমার সান্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুস্কৃতি হইতে, এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।"( ৬৬ :১০,১১)*

এবং কুরআনে আল্লাহ নূহ (আঃ) এর এক পুত্রের উদারহণও দিয়েছেন।


www.nagorikpathagar.org

# ৪.৩ হাদিসবেত্তাগণের দাবি ও রাসুল (সঃ) অনুসরণ

হাদিস যুগের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গত প্রায় ১৩ বছরে এই হাদিস বর্ণনাকারী, বহনকারী, সংকলনকারী, পরবর্তীতে হাদিস স্কলার ও শিক্ষকসহ হাদিন প্রচারণার সাথে জড়িত প্রায় সকলেই এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরিফ, প্রথম খণ্ড ভূমিকায় 'কেন হাদিস'– এ প্রশ্নে প্রায় অভিন্ন যুক্তি দেন। এসব যুক্তিসমূহের সার-সংক্ষেপ করলে তা হবে নিম্নরূপ :

১.আল্লাহ অনেক বিধি বিধান পালনের নিদের্শ দিয়েছেন কিন্তু কুরআনে এই বিধি-বিধান পালনের রীতি-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়নি।

২.কুরআন সঠিকভাবে ইসলাম রীতি-নীতি ও বিধিবিধান পালনে যথেষ্ট নয়।

৩.কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিবরণ প্রদানের ভার আল্লাহ ন্যাস্ত করেছেন রাসুলল্লাহ (সঃ)-এর ওপর।

৪.হাদিসের জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য ও তাৎপর্য এবং হুকুম আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায় না।

বাস্তবিকই কি আল্লাহ ইসলামের আদর্শ, লক্ষ্য ও তাৎপর্য বিধি-বিধান পালনের বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি?

এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের 'কুরআন কেন' পরিচ্ছদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত আরো বহু আয়াতের মধ্যে কয়েকটি :

*"-------; এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।" (১৭ : ১২)*

*"-------। ------। এইভাবে আল্লাহ তাহার আয়াত তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।" (২ : ২৬৬)*

*"-----। -----। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (৫ : ৮৯)*

*"এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নহে,-------- এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।" (১০ :৩৭)*



www.nagorikpathagar.org

*"-------। তিনি (আল্লাহ) সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আয়াতসমূহ (নিদর্শনসমূহ) বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিতে পার।" (১৩ : ৩)*

*"এইভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আর ইহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।" (৬ :৫৫)*

*"ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের জন্য আয়াতসমূহ (নিদর্শন) বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।" (৬ :১২৬)*

*"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত করিতে এবং তোমাদের ক্ষমা করিতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৪ :২৬)*

লক্ষণীয় যে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে দাবি করা হয় বা যে কারণসমূহ উল্লেখ করা হয় সে কারণসমূহ মেনে নিলে উপরোক্ত আয়াতসমূহসহ আরো শত শত আয়াত অস্বীকার করেই তা করতে হবে। এবং আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আয়াত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বহু হুঁশিয়ারি কুরআনেই উল্লেখ করেছেন। হাদিসবেত্তাগণ হাদিস অনুসরণের বড় যুক্তি দিচ্ছেন, কুরআনে রাসুল (সঃ)-কে অনুসরণ ও তার আনুগত্য সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করে। রাসুল (সঃ) কে অনুসরণের আদেশ দিয়ে কুরআনে বহু আয়াত আছে। তার মধ্যে কয়েকটি :

*"তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য তো রাসুলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।" (৩৩ :২১)*

*"রাসুল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে।---- ।" (৪ : ৬৪)*

*"বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ,তাহার রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য- যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান– যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (৯ :২৪)*


www.nagorikpathagar.org

*"......... । ....... । রাসুল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা তোমাদেরকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।" ( ৫৯ : ৭)*

*"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৩ :৩১)*

নিশ্চয়ই রাসুল (সঃ) কে অনুসরণ করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে আরো অনেক কিছুর মতোই এই হাদিসবেত্তাগণ 'অনুসরণ' প্রশ্নে কুরআনের ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। যা অনুসরণ নয়- রাসুল (সঃ) এর বাহ্যিক অনুকরণের প্রয়াস মাত্র।

আল্লাহ বলেন :

*"যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করিয়াছেন ফরজ (বিধান) তিনি তোমাকে অবশ্যয়ই ফিরাইয়া আনিবেন জন্মভূমিতে-- । ------- ।" (২৮ঃ৮৫)*

আল্লাহ আরো বলেন :

*"অনুসরণ কর তোমার প্রতিপালকের দিক হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে-" ( ৩৯ : ৫৫)*

*"এই কিতাব আমি নাযিল করিয়াছি যাহা কল্যাণকর। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও। তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে;.... ।" (৬ঃ ১৫৫)*

*"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবক অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।" (৭ঃ৩)*

কুরআনের প্রতিটি বিধি-বিধান উপদেশ রাসুলের জন্য ফরজ এবং রাসুলের অনুসারীদের জন্যও। কুরআনে বলা হচ্ছে, রাসুল সে বিধিবিধান উপদেশ অনুসরণের ক্ষেত্রে তার অনুসারীদের জন্য উত্তম আদর্শ। কুরআনই বর্ণনা করছে, কুরআনের আদেশ-নিষেধ, উপদেশ নিজ জীবনে সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠা এবং তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) বিশ্বাসীদের জন্য আদর্শ উদাহরণ। রাসুল যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর । তিনি কি পৌছে


www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন মানুষকে? কুরআন। কুরআনই বর্ণনা করছে, রাসুলের অনুসারীরা কি অনুসরণ করবেন, কিভাবে করবেন, কি পৌঁছে দেবেন মানুষের কাছে!

রাসুল (সঃ) কি অনুসরণ করেছেন, কিভাবে করেছেন এ বিষয়ে কুরআনে যেটুকু বলা হয়েছে সেটুই একমাত্র পূর্ণ সত্য। তার জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাকি যা বলা হচ্ছে, সেটি মানুষের বর্ণনা, তার কিছুটা সত্যের কাছাকাছি হতে পারে– তবে তা কেবল মাত্র কুরআনের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই। কোন মানুষ যদি রাসুল সম্পর্কে এমন কোন বিবরণ দেন, কুরআনে রাসুল (সঃ) কে যা করতে বলা হয়েছে তার সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাহলে প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে নিশ্চিত যে বর্ণনাকরী সত্য বলছে না।

আল্লাহ বলেন :

*"যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য করে না উহাদেরকে তিনি অবশ্যয়ই পুরস্কার দেবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪ :১৫২)*

আল্লাহ রাসুল (সঃ) ও মু'মিনদের কুরআন অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, মু'মিনদেরকে রাসুল (সঃ) কে অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই সাথে রাসুল (সঃ) ও মুমিনদেরকে ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্য নবীদেরকে অনুসরণেরও নির্দেশ দিচ্ছেন :

*"উহাদেরকে (ইব্রাহিম আঃ পরবর্তী ইসহাক আঃ মুসা আঃ, ঈসা আঃ-সহ সকল নবী ও রাসুল পূর্ববর্তী আয়াত, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬ যাহাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর। বল, 'ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।" (৬ঃ৯০)*

*"বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ হইয়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।" (৩ঃ৯৫)*

*"---এখন আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম 'তুমি একনিষ্ঠ হইয়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (১৬ : ১২২, ১২৩)*

*"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। ---------।-----। ---। তোমরা যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে প্রত্যাশা কর*


www.nagorikpathagar.org

*নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের (ইব্রাহিম ও তাহার অনুসারীদের) মধ্যে। ..........। (৬০ : ৪, ৫, ৬)*

প্রশ্ন হচ্ছে রাসুল (সঃ)-কে যখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীকে– তখন তিনি কিভাবে তাদের অনুসরণ করছেন ? তিনি কি সেই সময়ে আরবে এই নবীদের সম্পর্কে যেসব প্রচলিত কাহিনী ছিল যা সত্য বলে দাবি করাও হতো- সেসব অনুসরণ করেছেন নাকি মানুষের কথা– অথবা কুরআন? আল্লাহ বলেন :

*"রাসুলদের এই বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।" ( ১১ : ১২০)*

*"পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ।" (২০ : ৯৯)*

*"মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটইয়াছিলাম; অতঃপর বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদাইনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না আমার আয়াত তিলওয়াত করার জন্য। আমিই তো রাসুল প্রেরণকারী। মুসাকে আমি যখন আহবান করিয়াছিলাম তখন তো তুমি তুর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত ইহা (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে;" ( ২৮ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬)*

*"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি।, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া, যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।" ( ১২ঃ৩)*

রাসুল (সঃ) যে সেই সময়ে আরবে প্রচলিত ইহিতাস, ঐতিহ্য ও নবী-রাসুলগণ বা অতীত সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল তার কোনটিই গ্রহণ না কওে পূর্ণভাবে কুরআনের হাদিস অনুসরণ করেছেন তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার একটি সুরা কাহফ এ (১৮ঃ ৯-২২) আয়াতে আল্লাহ গুহাবাসীদের বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে এবং এ সংক্রান্ত রাসল (সঃ)-এর আল্লাহর আদেশ


www.nagorikpathagar.org

লক্ষণীয়। এই সুরার ২২ আয়াতে আল্লাহ্ গুহাবসীদের সংখ্যা সম্পর্কে সে সময়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ কাহিনী সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সেই সাথে রাসুল (সঃ)-কে সে কাহিনী যে সত্য নয়– সে সম্পর্কে অবহিত করছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে রাসুল (সঃ)-কে প্রকৃত ঘটনা জানাচ্ছেন। এরপরই একই আয়াতে আল্লাহ্ রাসুলকে বলছেন :

*"বল আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা ভালো জানেন। উহাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে।' সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদের কাহাকেও উহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।"*

আল্লাহ্ তার রাসুল (সঃ) কে 'প্রচলিত কাহিনী' বর্জন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন।

ঠিক একইভাবে এই সুরায় গুহাবাসীরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল সে সম্পর্কে বলছেন :

*"উহারা উহাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর আরো নয় বৎসর।" (১৮ :২৫)*

কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে সুনিদ্দিষ্টভাবে এ তথ্য জানানোর পরও আল্লাহ্ রাসুলকে বলছেন :

*"তুমি বল, তাহারা কতকাল ছিল, তাহা আল্লাহই ভালো জানেন, আকা মণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাহারই --------। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে পাঠ করিয়া শোনাও। তাহার বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নাই-----।" ( ১৮ : ২৬,২৭)*

কুরআনই ব্যাখ্যা দিচ্ছে, কুরআন বিশ্বাসীদেরকে, মুহাম্মাদ (সঃ) পূর্ববর্তী নবী-রাসুলসহ ধর্মসংক্রান্ত যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল সেসব ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল কাহিনী বর্জন করে শুধুমাত্র কুরআনে উল্লিখিত বর্ণনা সত্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। রাসুল (সঃ) নিজে সর্বক্ষেত্রে কুরআন অনুসরণ করেছেন। সুতরাং রাসুলকে অনুসরণ করতে হলে কুরআনই অনুসরণ করতে হয়। কুরআনের অনুসরণেই রাসুলের অনুসরণ।

এখানে আরেকটি প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে। রাসুল (সঃ) সয়ং যে কাহিনী বর্জন করার জন্য নির্দেশিত হচ্ছেন, সেই সব কাহিনীর ওপর নির্ভর করে অসংখ্য 'রাসুলে হাদিস' কিভাবে সত্য হতে পারে এবং কিভাবেই বা আরবে প্রচলিত নবী-রাসুল সম্পর্কে সেসব লোককথার ওপর নির্ভর করে একদল


www.nagorikpathagar.org

তাফসিরকারক কুরআনে রাসুল (সঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসুল সম্পর্কে আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন?

আল্লাহ বলেন :

"------। *আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করেন না।" ( ২৮ :৫০)*

সিয়াহ সিত্তাহ সংকলনে যেসব সাহাবি অধিকসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন :

১.আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রকৃত নাম আবদুর রহমান

জন্ম : ৬০৩/৬০৪ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ৬৮১ খ্রিস্টাব্দ, বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা : ৫৩৭৪ টি

২. আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ),জন্ম : ৬১৩/১৪ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু ৬৭৮, বর্ণিত হাদিস সংখা ২২১০টি

৩. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), জন্ম : ৬১২ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু ৭১৩ খিস্টাব্দ, বর্ণিত হাদিস : ২৫০০ টিরও বেশি

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), জন্ম : ৬০৯ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ বর্ণিত হাদিস : ১৬৬০টি

৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), জন্ম : ৬০৮ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ৬৯২ খ্রিস্টাব্দ, বর্ণিত হাদিস ১৬৩০টি

৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), জন্ম ৬০২ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ, বর্ণিত হাদিস : ১৫৪০টি

লক্ষণীয় যে, একমাত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) ব্যতীত আর হদিস বর্ণনাকারী এই সকল সাহাবির রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের সময় বয়স ছিল ২০-এর কোঠায়। একমাত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) মাত্র ৩০-এর কোঠায় পা দিয়েছিলেন। এই সাহাবিদের কেউই মক্কা বিজয়ের আগে বা পরে যুদ্ধে অংশ নিযেছেন ও যুদ্ধে সম্পদ ব্যয় করেছেন তাদের জীবনীতে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আল্লাহ বলেন :

"------। *তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে। তাহারা মর্যদায় শ্রেষ্ঠ উহাদের*


www.nagorikpathagar.org

*অপেক্ষা যাহারা পরবর্তীকালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।" (১০ : ৫৭)*

হাদিসের সত্যতা প্রমাণ হিসেবে হাদিসবেত্তাগণ দাবি করেন, আরবের লোকেরা সেই সময় এত স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে তারা একবার কিছু শুনলে তার কিছুই ভুলতেন না। হুবহু উচ্চারণ করতে পারতেন।

"তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত বুখারী শরিফ- প্রথম খণ্ড-ভূমিকা -৩০ পাতা তৃতীয় প্যারাগ্রাফ)

কিন্তু আল্লাহ্ বলেন :

"*কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না আমি আগামী কাল উহা করিব, 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে- এই কথা না বলিয়া।' যদি 'ভুলিয়া' যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।" ( ১৮ :২৩, ২৪)*

এই আয়াতে আল্লাহ রাসুল (সঃ) এবং তার মাধ্যমে তার বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে কোন কিছু ভুলে যাওয়া মানুষের জন্য স্বাভাবিক। মানুষের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি সৃষ্টিকর্তা কুরআনে বেশ কয়েকবারই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি প্রসঙ্গে সর্বাধিকসংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ) কি বলছেন :

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, 'আমি (আবু হুরায়রা) বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদিস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।'

তিনি (রাসুলাল্লাহ) বললেন, 'তোমার চাদর খুলে ধর।'

আমি (আবু হুরায়রা) তা খুলে ধরলাম।

তিনি (রাসুলাল্লাহ) দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মতো করে (বা হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কিছু দিলেন) বললেন, 'এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর।


www.nagorikpathagar.org

আমি (আবু হুরায়রা) তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত বুখারী প্রথম খণ্ড : ১২০ নম্বর এবং বাংলা একাডেমী অনূদিত তাজরীদুল বুখারী– বাংলা একাডেমী প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর : ৯৯)

আবু হুরাইয়া (রাঃ) আরো বলেন : এক আনসারী সাহাবি রাসুল্লাহের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল। আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে; কিন্তু মনে রাখতে পারি না। নবী করীম সঃ বললেন, তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বুখারী শরিফ- প্রথম খণ্ড -ভূমিকা -৩১ পাতা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ)।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কুরআনই বলছে, আরবদের তথাকথিত স্মরণশক্তির ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মাদ (সঃ) এর সময় আরবে তাদের যে ইতিহাস, ঐতিহ্য বা ইব্রাহীম (আঃ)সহ অন্য নবীদের সম্পর্কে যে সব ধর্ম, কাহিনী বা ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল মুহাম্মাদ (সঃ) তার কিছুই সত্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। কুরআন পুনঃপুনঃ মুহাম্মাদ (সঃ)কে সেসব বর্জন করে কুরআনের বাণীতে যা বলা হচ্ছে একমাত্র তার ওপর নির্ভরশীল থাকতে নির্দেশ দিচ্ছে।

হাদিসবেত্তাগণ আরবদের উপরোক্ত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে স্মরণশক্তির পাশাপাশি কিছু হাদিস (রাসুল) লিখিত রূপও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন :

"এসব ঘটনা থেকে পরিস্কারভাবে প্রমানিত হয় যে নবী সঃ-এর সময় থেকেই হাদিস লেখার কাজ শুরু হয়। তার দরবারে বহুসংখ্যক লেখক সাহাবি সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তার মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে রাখতেন।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বুখারী শরিফ- প্রথম খণ্ড- ভূমিকা -৩২ পাতা তৃতীয় প্যারাগ্রাফ)।

তবে এই লিখিত হাদিস সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নিম্নের বর্ণনা লক্ষণীয় : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভায়েরা জমাজমির কাজে মশগুল থাকত । আর আবু হুরায়রা (খয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসুলুল্লাহের সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্ত করত না সে তা মুখস্ত করত।


www.nagorikpathagar.org

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত বুখারী শরিফ প্রথম খণ্ড -১১৯ নং হাদিস : এবং বাংলা একাডেমী অনূদিত তাজরীদুল বুখারী- বাংলা একাডেমী প্রথম খণ্ড ৯৮ নম্বর হাদিস)

এই হাদিসের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কৃত দাবি ও মুহাজির-আনসার অন্যান্য সাহাবিদের প্রতি মন্তব্য লক্ষণীয়!

হাদিসবেত্তাগণ হাদিসের নানা শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তবে এর মধ্যে প্রধান ভাগ হচ্ছে 'কাওলী' হাদিস। এই শ্রেণীভুক্ত হাদিসের সংখ্যা সিয়াহ সিত্তাহে সর্বাধিক। এই হাদিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

কাওলী হাদিসঃ এই কাওলী হাদিস সম্পর্কে বলা হচ্ছে ফকিহ ও মুহাদ্দিসরা বলছেন, সাহাবিদের 'প্রশ্নের' উত্তরে অথবা তাদের শিক্ষার জন্য সময়োচিতভাবে রাসুল (সঃ) যা বলেছেন সেগুলোকে কাওলী হাদিস, অর্থ্যাৎ যে সকল হাদিসে রাসুল (সঃ) এর কোন কথা বিবৃত হয়েছে তাকে কওলী হাদিস বা বাণী সম্পর্কিত হাদিস বলা হয়।

সিয়াহ সিত্তাহে উল্লেখিত এসব হাদিসে বর্ণনার শুরুটি এমন : 'সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (সঃ) বলেন,........।' সাহাবিরা নবী (সঃ)-কে প্রায়শ:ই প্রশ্ন করছেন এবং নবী (সঃ) সে সব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিচ্ছেন।

কিন্তু কুরআন উপদেশ দিচ্ছে :

*"হে মু'মিনগণ! তোমরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তাহা তোমাদিগকে কষ্ট দেবে। কুরআন নাজিলের সময় তোমরা যদি সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ সেইসব ক্ষমা করিয়াছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল; অত:পর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।' ( ৫ঃ ১০১ ও ১০২)*

*"তোমরা কি তোমাদের রাসুলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও, যেইরূপ প্রশ্ন পূর্বে মুসাকে করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।" (২ঃ ১০৮ )*

মুসার সম্প্রদায়ের প্রশ্ন করা সংক্রান্ত উদাহরণও কুরআন তুলে ধরেছে :

*"স্মরণ কর, যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবেহ করিতে আদেশ দিয়াছেন', তাহারা বলিয়াছিল,*


www.nagorikpathagar.org

*তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ?'*

*মুসা বলিল, 'আল্লাহর শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'*

*তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কিরূপ?'*

*মুসা বলিল, আল্লাহ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়– মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।'*

*তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্ট জানাইয়া দিতে বল, উহার রং কি?'*

*মুসা বলিল, 'আল্লাহ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রঙ উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদের আনন্দ দেয়।'*

*তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কোনটি ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাইব?"*

*(২ : ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০)*

কুরআনে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। এ উদাহরণে স্পষ্ট যে, আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী একটি গরু জবেহ্ করার আদেশ দিলে মুসা আঃ-এর সম্প্রদায় গরুটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানার জন্য নবীকে একের পর এক প্রশ্ন করেন যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের আয়াতে মুসা আঃ-এর উক্ত ঘটনার স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করেছেন।

মুসা (আঃ)-কে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করছেন। গরুটি চিহ্নিত করণের মতো আরো বহু প্রসঙ্গে বহু প্রশ্ন করা যায়। কোন বিষয় সম্পর্কে জানার প্রশ্ন মাত্রায় শেষ বলে কিছু নেই!

গরুটি কোনটি সেটি যখন সুনির্দিষ্ট করা হলো, তখন এর জবেহ্ সম্পর্কে 'তথাকথিত বিস্তারিত' জানার জন্য প্রশ্ন করা যায়, সে বিষয়টি সুরাহা হলে, যে ছুরি দিয়ে জবাই করা হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ দূর করার প্রশ্ন উঠতে পারে, সে বিষয়ে সুরাহা হলে, কোন দিনে, কোন সময়ে জবেহ্ করতে হবে সে সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করা যায় এবং সে বিষয়টি কোন মতে শুরাহা করা গেলেও আবার কোন স্থানে জবেহ্ করতে হবে, কে জবেহ্ করবে, তার পোশাক কি


www.nagorikpathagar.org

হবে– সেসব বিষয়ে 'তথাকথিত সন্দেহ' দূর করার জন্য বহু প্রশ্ন করা যায়– এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতেই পারে।

মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় মাত্র তিনটি প্রশ্ন করেই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গরু জবহের বিষয়ে প্রশ্ন করা ক্ষ্যান্ত দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে মাত্র এই তিনটি প্রশ্ন করাই অসংগত। কিন্তু হাদিসে সাহাবিদের শতশত প্রশ্ন চলছে, সালাত, জাকাত, হজ, সিয়ামসহ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে তথাকথিত বিস্তারিত জানার কথা বলে হাজারও প্রশ্ন। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত উদাহরণসহ এই প্রশ্ন নিষিদ্ধ সত্ত্বেও যে প্রশ্ন করা হচ্ছে– এই হাদিস সংকলনকারী ইমামগণ সেগুলোকে সহিহ হাদিস এবং প্রশ্নকারীদের সাহাবি হিসেবেও দাবি করছেন!

এ সম্পর্কে একটি হাদিস লক্ষণীয় :

'আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ)-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল করীমে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পছন্দ করতাম গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি------।' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত বুখারী শারিফ, প্রথম খণ্ড, ৬৩ নম্বর হাদিস)।

আনাস (রাঃ) এর নামে বহু হাদিস সহি সিত্তাহে সংকলিত হয়েছে। তবে হাদিসে আনাস (রাঃ) নিজে স্বীকার করছেন, পবিত্র কুরআনে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ জানার পরও, কেউ প্রশ্ন করুক তিনি তা পছন্দ করতেন! তিনি জেনে-শুনে তার হৃদয় দিয়ে চাইছেন, আয়াতে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা কারো মাধ্যমে লংঘিত হোক! অর্থাৎ কুরআনের আয়াত তিনি মনে প্রাণে মেনে নেননি!

বিশ্বাসী হিসেবে দাবিদারদের একটি অংশের প্রশ্নের ধারাটি এখন আরো প্রবল হয়েছে। একটি শ্রেনী আলেম, মূহাদ্দিস, ফকিহ্, স্কলার, তাফসিরকারক-ইত্যাদি নাম ধারণ করে সিয়াহ সিত্তার বাণীর নাড়ি-নক্ষত্র, দাড়ি, কমা বিশ্লেষণসহ সেই সাথে কখনো বা নিজের উদ্ভাবিত কিছু তত্ত্ব তার সাথে জুড়ে দিয়ে এসব অবান্তর প্রশ্নের শুধু উত্তরই দিচ্ছেন না– তাদের আবিষ্কৃত এ উত্তর 'ইসলামের বিধান' বা 'আল্লাহর বিধান', 'শরিয়া আইন'- ইত্যাদি হিসেবে নামকরণ, প্রচার-প্রচারণা, শিক্ষাদান করছেন– সে উত্তর আল্লাহর নামে রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছেন। উপরন্ত বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ইসলামের নামে তীব্র


www.nagorikpathagar.org

মতবিরোধ সৃষ্টি করাও হচ্ছে।

আল্লাহ স্বয়ং তার বিধান পালনে এই খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে মানুষকে ক্ষমা করেছেন; কিন্তু একটি অংশ আল্লাহ ও রাসুলের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদেরকে আলেম, মুহাদ্দিস, ফকিহ্, স্কলার, তাফসিরকারক ও হাদিসবেত্তা দাবি করে কোনভাবেই এসব বিষয় থেকে যেন কোনভাবেই মানুষকে ক্ষমা করতে রাজি নয়!

এই হাদিসের আরো কতগুলো বিষয় লক্ষণীয় :

প্রথমত : বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও কুরআনের বাণীসমূহ এবং সিয়াহ সিত্তাহে সংকলিত বাণীসমূহ একবারে উল্টো। এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছদে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, কুরআনের একই বিষয়ে বাণীগুলো ঘটনার বর্ণনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সুরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করলেও একই বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াতের সাথে আরেকটি আয়াত যোগ করলে তার অর্থ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে– এভাবে যত আয়াত যোগ করা যায় সে বিষয়টি ততই স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু হাদিসের বাণীর বৈশিষ্ট্য ঠিক তার বিপরীত। লক্ষণীয় যে, একই বিষয় সম্পর্কিত হাদিস যত বেশি একত্রে যোগ করা হবে, ঐ বিষয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি তত বেশি জোরাল হবে। এ সম্পর্কে শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে তার দু-একটি :

'আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও সুপারিশ গৃহীতকারী ব্যক্তি।' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মুসলিম শরিফ- পঞ্চম খণ্ড, ৫,৭৪১ নম্বর হাদিস)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি গালাগালি করিয়াছিল। একজন মুসলিম আরেকজন ইয়াহুদি। মুসলমানটি বালিয়াছিল, তাহার শপথ যিনি মুহাম্মাদ (সঃ) কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত করিয়াছেন। তখন ইয়াহুদিটি বলিয়াছিল, তাহার শপথ যিনি মুসা (আঃ)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত করিয়াছেন। তাহাতে মুসলিম ব্যক্তিটি হাত উঠাইয়া ইয়াহুদিটির মুখে এক চড় মারিল। তখন ইয়াহুদিটি নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ও ঐ মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা জানাইল। নবী (সঃ) ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে


www.nagorikpathagar.org

সকল কথা বলিল। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, 'তোমরা আমাকে মুসার ওপর প্রধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। আমিও তাহাদের সহিত বেহুঁশ হইব। তারপর আমি সকলের প্রথমে চেতনা পাইব। তখন দেখিব কি যে, মুসা আল্লাহর আরশের এক পাশ ধরিয়া রহিয়াছেন। আমি জানি না যাহারা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন এবং আমার আগেই চেতনা পাইয়াছিলেন অথবা তিনি তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ (বেহুঁশ হইতে) রেহাই দিয়াছিলেন।' (তাজরীদুল বুখারী- বাংলা একাডেমী প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর ১০৯৭)

'আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন : তাহার হস্তে আমার প্রাণ তাহার কসম, তোমাদের কাহারও সঙ্গে এক গাছা রজ্জু লইয়া বাহির হওয়া এবং কাষ্ট সংগ্রহ করত : পিঠে বহন করিয়া আনা ইহা অপেক্ষা উত্তম যে, কোন ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিবে, সে তাহাকে দান করিবে অথবা তাহাকে বিমুখ করিবে।' (তাজরীদুল বুখারি-প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ - বাংলা একাডেমী ৭৪০ নম্বর হাদিস)

'যুবাইর (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে নবী (সঃ) বলিয়াছেন : কাঠের বোঝা পিঠে করিয়া বহন করিয়া আনিয়া উহা বিক্রয় করা এবং উহার দ্বারা আল্লাহ যে তাহার সম্মানি রক্ষা করেন– উহা তাহার জন্য এতদপেক্ষা ভালো যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা করিবে, তাহারা তাকে প্রদান করিবে অথবা বিমুখ করিবে। (তাজরীদুল বুখারি-প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ - বাংলা একাডেমী, ৭৪১ নম্বর হাদিস)

দ্বিতীয়ত : এই সিয়াহ সিত্তাহে সংকলিত প্রশ্নের যে সব কথিত উত্তর নবী (সঃ)-এর বলে দাবি করা হচ্ছে, তার মধ্যে বহু হাদিস কুরআনের আয়াত, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইসলামের মূল নীতি ও দর্শনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও অতিকথনের দোষে দুষ্ট। কুরআনের বর্ণনায় যে ধীর-স্থির, দৃঢ় এবং মহত্তম চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী, স্বল্পভাষী, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও অনুগত একজন মানুষ হিসেবে রাসুল (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পক্ষান্তরে হাদিসের বর্ণনায় তিনিই এমন একজন রাসুল যিনি অস্থির, অতিকথক, উদ্ধত, দূরদৃষ্টিহীন মানব মাত্র। উপরন্ত এই সিয়াহ সিত্তাহে এমন কিছু বাণীও রাসুল (সঃ)-এর বাণী হিসেবে সংকলিত করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআন, ইসামের সকল বিধি-বিধান


www.nagorikpathagar.org

এবং এমনকি রাসুল (সঃ) দীর্ঘ কর্মময় জীবন ও তার সকল অর্জন– সব কিছুই অস্বীকার করা হয়েছে। এই সব হাদিস সত্য হলে কুরআন অসত্য হয়ে যায়। এ সম্পর্কিত সত্যতা প্রমাণে শত শত হাদিসের মধ্যে কয়েকটি হাদিস এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

'আসহাক ইবনে মানসুর (রাঃ) .... আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সঃ) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) একই বাহনে সাওয়ার হয়েছিলেন। এ অবস্থায় নবী (সঃ) বললেন, হে মু'য়াজ ইবন জাবাল! মু'য়ায (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বান্দা হাজির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসুল (সঃ) আবার বললেন, হে মু'য়ায। মু'য়ায (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! বান্দা হাজির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসুল (সঃ) আবার বললেন, যদি কোন বান্দা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তার রাসুল, তবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করবেন। মুয়ায বললেন, হে আল্লাহর রাসুল। এ খবর লোকদের কি দিয়ে দেবো যাতে তারা সুসংবাদ পায়? রাসুল (সঃ) বললেন তাহলে লোকেরা এর ওপর নির্ভশীল হয়ে পড়বে। পরে সত্য গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে মুয়ায (রাঃ) অন্তিমকালে এ খবর শুনিয়ে গিয়েছেন।' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত মুসলিম শরিফ প্রথম খণ্ড- ৫৫ নম্বর হাদিস)

ঠিক একইভাবে এই একই মর্মার্থের একটি হাদিস ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপটে ভিন্ন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মাহমুদ ইনুর রাবী (রাঃ) রাসুল (সঃ) একই কথা বলেছেন বলে দাবি করেন। মাহমুদ ইনুর রাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন : ......সাহাবিরা নিজেদের আলোচনায় এক মালিক ইবন দুখশুম নামে এক ব্যক্তিকে মুনাফিক উল্লেখ করলে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মুমিনদের দৃষ্টিতে এক মুনাফিক নামাজ সম্পন্ন করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ সঃ) আল্লাহর রাসুল– এ কথার সাক্ষ্য দেবে আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না কিম্বা আগুন তাকে দগ্ধ করবে এমন হবে না। আনাস (রাঃ) বলেন, হাদিসটি আমাকে বিস্মৃত করেছিল । আমি আমার পুত্রকে বললাম হাদিসটি লিখে নাও। সে লিখে রাখল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন মুসলিম শরিফ প্রথম খণ্ড- ৫৬ নম্বর হাদিস)

'যুহায়ব ইবন হারব (রা:).. .. .. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে,


www.nagorikpathagar.org

রাসুলুল্লাহ (সঃ) 'হে আবু হুরাইয়া বলে তার পাদুকা জোড়া প্রদান করলেন আর বললেন আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেই। এ কথা শুনে উমর (রাঃ) আমার ( আবু হুরায়রা রাঃ) বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তখন তিনি (ওমর রাঃ) বললেন, ফিরে যাও, হে আবু হুরায়রা। আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় রাসুলুল্লার খিদমতে ফিরে এলাম। আর সাথে সাথে উমরও আমার পেছনে পেছনে এলেন। রাসুলূল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে? আরয করলাম, ওমর (রাঃ)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা ওমরকে জানাই। এতে তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। আর তিনি আমাকে ফিরে আসতে বললেন।' রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'হে ওমর! কিসে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে ? তিনি উত্তর দিলেন 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবু হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষৎ হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও ? রাসুল (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ। ওমর (রাঃ) বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশংকা করি যে, লোকেরা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। । তারপর রাসুলুল্লাহ বললেন : 'আচ্ছা তাদের ছেড়ে দাও!' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত মুসলিম শরিফ প্রথম খণ্ড- ৫৭ নম্বর হাদিস)

উপরের তিনটি হাদিসে রাসুল (সঃ)-এর মূল বক্তব্য একই বলা হচ্ছে কিন্তু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তিন তিনজন এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এবং বর্ণনায় ও মূল বক্তব্যে যা বলা হচ্ছে এবং রাসুল (সঃ)-কে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা খুবই লক্ষণীয়।

কোন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যখন অন্য একজন ব্যক্তির কোন উক্তি, ঘটনা, কর্ম বা তার জীবনযাপন সম্পর্কে তৃতীয় আরেকজনের নিকট বর্ণনা করেন, তখন প্রশ্ন উত্থাপন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি এই


www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা করছেন তিনি সত্য ও নির্ভুল বলছেন কিনা? উপরন্ত সেটি যদি উক্তি হয়, তবে মূল বক্তা তার উক্তিতে যে শব্দ ও বাক্য, বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তা হুবহু একইভাবে উচ্চারিত করা হয়েছে কি না এবং মূল বক্তা যে অর্থে এই উক্তি করেছেন বর্ণনাকারীর ভাষ্যে সে উক্তিটি একই অর্থ বহন করছে কি না?

তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে এসব প্রশ্ন উত্থাপন খুবই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের ইতিহাস পরিচ্ছদে আলেচনা করা হয়েছে।

বাক্যের অন্তর্গত একটি শব্দের স্থান পরিবর্তন বা সামান্য একটি যতি চিহ্নের পরিবর্তনে বক্তার উক্তির অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার আশংকাও আছে।

এ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

'কেহই জানে না আল্লাহ ছাড়া' এবং 'আল্লাহ জানেন'– এ দুটি বাক্যের অর্থেও পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ যখন বলেন কেহই জানে না আল্লাহ ছাড়া– তখন তার অর্থ একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেননা– বিষয়টি মানুষের কাছে গুপ্ত। তবে আল্লাহ যখন বলেন তিনি জানেন, তার অর্থ হচ্ছে তিনি জানেন এবং মানুষও জানতে পারে। কিন্তু কোন শ্রোতা যদি এই পার্থক্যটি খেয়াল না করেন তখন কারো কোন উক্তির বর্ণনা তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তুলে ধরবেন সেখানে অর্থের পার্থক্য জটিল হতে পারে। সম্ভবত অদৃশ্য বিষয় নিয়ে কুরআনের আয়াতের এমনই বিকৃত বর্ণনা বহু হাদিসে লক্ষ্য করা যায়। এর একটি– কুরআন বলছে :

"*কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে, কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (৩১ :৩৪)*

পক্ষান্তরে :

'ইবনে ওমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন অদৃশ্য ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান প্রধানত পাঁচ প্রকার : আল্লাহ ছাড়া আর কেহই ইহা জানে না, কাল কি হইবে তাহা কেহই জানে না; গর্ভে কি আছে তাহা কেহই জানে না; কেহই জানে না কাল সে কি অর্জন করিবে, কেহই জানে না কোন ভুখণ্ডে সে মরিবে এবং কেহই জানে না কখন বৃষ্টি হইবে। (তাজরীদুল বুখারি-প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ– বাংলা একাডেমী, ৫৪৯ নম্বর হাদিস)।


www.nagorikpathagar.org

## ৪.৪ হাদিসে বিশ্বাস ও উপসংহার

কোন ব্যক্তি যদি কোন এক কারণে কোন বর্ণনাকারীর কৃত 'উক্তি' সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বলেন, যে তিনি সাক্ষী বা তার দেওয়া সাক্ষ্য পরিপূর্ণ সত্য বা সঠিক হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না বা এই 'বর্ণনা' বিশ্বাস করেন না, তবে তার অর্থ কখনই এই নয়– যে তিনি 'মূল বক্তা' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন। প্রকৃত অর্থে তিনি 'সাক্ষী'র বিশ্বাসযোগ্যতা অথবা 'সাক্ষ্য'-এর নির্ভুলতা, সত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সিয়াহ সিত্তাহ মূলত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দৈনন্দিন জীবনযাপন, কর্ম, বক্তব্য ও ঘটনা সম্পর্কে কিছু মানুষের বর্ণনার সংকলন। সুতরাং এই সংকলিত কোন বর্ণনা বা বাণীর বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন মূলত যারা এই সাক্ষ্য সংকলনের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির বা তাদের দেওয়া বর্ণনার সত্যতা বা নির্ভুলতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন। এ প্রশ্ন মূলত সাক্ষী ও সাক্ষ্য সম্পর্কে। সুতরাং এই সংকলিত বাণী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন আল্লাহর রাসুল (সঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের পর্যায়ে কোনভাবেই পড়ে না।

ঠিক একইভাবে যদি এক্ষেত্রে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে তবে সে প্রশ্ন রাসুল (সঃ)-কে বিশ্বাসের অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, তা হলো যারা রাসুল (সঃ) সম্পর্কে যে বা যারা সাক্ষী দিচ্ছেন এবং তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা বা না করার প্রশ্ন জড়িত। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের মূল ভিত্তি, 'বিশ্বাস ও সৎ কর্ম'।

*"যাহারা 'ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে' তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত-- ।----- ।" (২ : ২৫)*

*"নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা ইয়াহুদি হইয়াছে এবং খ্রিস্টান ও সাবিঈন-যাহারাই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।" (২ :৬২)*

*"আর যাহারা 'ঈমান আনে ও সৎকাজ করে' তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। (২ :৮২)*



www.nagorikpathagar.org

কুরআনের অধিক আয়াতবিশিষ্ট প্রায় প্রতিটি সুরায় এই সংক্রান্ত আয়াতটি অন্তত একবার হলেও এসেছে। বেশ কয়েকটি সুরা আছে এই আয়াতটি বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র কুরআনে কখনো সরাসরি কখনো উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এই 'বিশ্বাস ও সৎকর্ম'-এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে কোন কোন বিষয়ে বিশ্বাস, কিভাবে বিশ্বাস, কেন বিশ্বাস, কোন কোন বিষয় বিশ্বাসের পরিপন্থী অথবা বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত বহু আয়াত রয়েছে। তবে তার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কিত আয়াতের কয়েকটি :

*"যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাহারাই তাহদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।" (২ :৩, ৪, ৫)*

*"রাসুল তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে, এবং মু'মিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহ, তাহার ফেরেশতাগণে, তাহার কিতাবসমূহে, এবং তাহার রাসুলগণে ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে), আমরা রাসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না,' আর তাহারা বলে, আমরা শুনয়াছি এবং পালন করিয়াছি।-----।" (২:২৮৪)*

*"বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং ইব্রাহীম, ঈসমাইল, ঈসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং তাহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।" (৩:৮৪)*

*"হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহে, তাহার রাসুলে, তিনি যে কিতাব তাহার রাসুলে প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ তাহার ফেরেশতাগণ,*


www.nagorikpathagar.org

*তাহার কিতাবসমূহ, তাহার রাসুলগণ এবং আখিরাত প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।" ( ৪ঃ ১৩৬)*

*"তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসুলের প্রতি ঈমান আন--------- ।" (৫৭ : ৭)*

*"তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? অথচ রাসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে..........- ।" (৫৭ : ৮)*

উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে কোন কোন বিষয়ে ঈমান আনয়ন একজন বিশ্বাসীর জন্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং হাদিস বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বাণী এবং এসব বাণী সংকলনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কোন বিশ্বাসীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু রাসুল (সঃ) তার নামে প্রচারিত এসব বাণী বা সাক্ষ্য নিজে সত্যায়ন করেননি সুতরাং এ বিষয়ে তার কোন দায়-দায়িত্বও নেই। এ প্রেক্ষিতে বহু আয়াতের মধ্যে দুটি :

"এবং তাহারা যদি তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।" (১০ঃ৪১)

"বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী ? বল, 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদেরকে এবং যাহার নিকট ইহা (কুরআান) পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদদ্বারা (কুরআন দ্বারা) আমি সতর্ক করি। ---- ।" (৬ :১৯)

উপরের আয়াত দুটির সাথে সুরা হাজ-এর রুকু ৭-এর আয়াতসমূহ যোগ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে।

*"বল, হে মানুষ আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী; সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা; এবং যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।*

*আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসুল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, তখনই শয়তান তাহার (রাসুলদের)*


www.nagorikpathagar.org

*আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ইহা এইজন্য যে শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, ও যাহারা পাষাণ হৃদয়। নিশ্চয় জালিমরা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে। এবং ইহা এই জন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে, যে ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং তাহাদের অন্তর যেন উহার (আল্লাহর আয়াতসমূহ-এর) প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ তাহাদেরকে অবশ্যয়ই সরল পথে পরিচালিত করেন।*

*যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষন হইতে বিরত হইবে না যতক্ষণ না উহাদের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে অথবা আসিয়া পড়িবে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। সেই দিন আল্লাহর আধিপত্য; তিনিই তাহাদের বিচার করিবেন, সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে। আর যাহারা কুফরি করে ও আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" ( ২২ঃ ৪৯-৫৭)*

উপরের রুকুর আয়াতসমূহের মধ্যে ২২ঃ৫২ আয়াতের অনুবাদে বাংলা 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দটি লক্ষণীয়। আরাবিতে 'তামান্না' শব্দটির বাংল অনুবাদ করা হয়েছে আকাঙ্ক্ষা। এই আরাবি তামান্না শব্দটির অর্থ প্রকাশে বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাওলানা ইউসুফ আলী কুরআনের তার ইংরেজি অনুবাদে তামান্না শব্দটির অনুবাদ করেছেন Naration -বাংলায় যা বর্ণনা, ব্যক্ত করা। অনেকেই এই শব্দটির অনুবাদ করেছন আশা ও ইচ্ছা প্রকাশ-ইত্যাদি। তবে কুরআনে ব্যবহৃত আর সব শব্দের মতো এই তামান্না শব্দটির ব্যাখ্যাও সংশ্লিষ্ট আয়াতের বাক্য গঠন ও পূর্বাপর অন্যান্য শব্দের সাথে সাথে সম্পর্কেও মধ্য দিয়ে কুরআনই ব্যখ্যা দিচ্ছে। সে ব্যাখ্যায় এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত রাসুলের সকল বাণী, বর্ণনা এবং কুরআনের আয়াতও। আল্লাহ মূলত এই আয়াতে তো বটেই এই সুরা হাজ-এর ৭ম রুকুটিই মূলত কুরআনের আয়াতের সম্পর্কে মানুষ অবগত করছেন। রুকুতে কয়েকটি বিষয় খুব লক্ষণীয় :


www.nagorikpathagar.org

০১.আল্লাহর রাসুলগণ যখনই কিছু বর্ণনা, আকাংখ্যা বা কোন উক্তি করেন তখনই শয়তান সেখানে কিছু প্রক্ষিপ্ত করে।

০২. শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তার বিদূরিত করেন।

০৩. আল্লাহ রাসুলগণের উক্তি, বর্ণনা বা আকাক্ষার মধ্য থেকে কেবল মাত্র তাঁর আয়াতসমূহ শয়তানের প্রক্ষেপণ থেকে রক্ষা করা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

০৩.আল্লাহর আয়াত ব্যতীত রাসুলগণের অন্যসকল উক্তি আকাক্ষা বা কোন বর্ণনা অবিকৃত অবস্থায় বা শয়তানের প্রক্ষেপণমুক্ত রাখা বা রক্ষা করার অঙ্গীকার করেননি।

০৪.আল্লাহর আয়াত ব্যতীত রাসুলের অন্যান্য বিষয়সমূহ যা কুরআনের ভাষায় শয়তানের প্রক্ষেপণযুক্ত সেগুলোকে আল্লাহ যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেন।

০৫.আল্লাহর আয়াতসমূহই কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে প্রকৃত সত্য। এবং আল্লাহ তাহার আয়াতসমূহকেই কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ।

০৬. মহাসাফল্য বা শেষ বিচারে সাফল্যের জন্য আল্লাহ তার একমাত্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করার উপদেশ দিচ্ছেন।

০৭. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে কোন ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে বা অস্বীকার করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে শাস্তি।

০৮. আল্লাহর আয়াতে যারা ঈমান আনে, এই আয়াতসমূহের প্রতি অনুগত হয় এবং সে অনুযায়ী সৎ কর্ম করেন তারাই চূড়ান্ত বিচারে সাফল্য লাভ করবেন।

লক্ষণীয় যে রাসুল (সঃ) তার নবুওয়াত প্রাপ্তিপূর্ব চল্লিশ বছরের জীবনে বহু উক্তি করেছেন, খুবই স্বাভাবিক রাসুল (সঃ) তার নবুওতপ্রাপ্তির পরও তেইশ বছর ধরে কুরআনের আয়াত পাঠ ও প্রচারসহ তার দৈনন্দিন জীবনযাপনে বহু উক্তি, পরামর্শ , আদেশ উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ, রাসুলের এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত রক্ষার অঙ্গীকার করেছেন।

মুহাম্মাদ (সঃ) সকল মুখ নিঃসৃত উক্তি বা বর্ণনা প্রধাণত : দুই প্রকার :

এক. মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী যা আল্লাহর আয়াত হিসেবে পবিত্র কুরআনে সংকলিত করা হয়েছে।

দুই. এই কুরআনের আয়াত ব্যতীত বাকি সবই সিয়াহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন গ্রন্থে


www.nagorikpathagar.org

সংকলিত করে ফকিহদের ভাষায় 'হাদিস' নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপন খুবই যুক্তিসঙ্গত, 'সিয়াহ সিত্তাহে' বা অন্য সকল গ্রন্থে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 'কথা' বা 'বাণী' 'কর্ম' বা 'উক্তি' হিসেবে যা দাবি করা হচ্ছে, কুরআনের আলোকে বিশ্বাসীদের কাছে সেসব কথা, বাণী, কর্ম ও উক্তির অবস্থানটি কি অথবা যারা কুরআনের আলোকে যাচাই-বাছাই ছাড়া অন্ধের মতো এগুলোর ওপর ভিত্তি করে ধর্ম চর্চা করছেন কুরআনের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থানই বা কি?

আল্লাহ বলেন :

*'উহাদের (মুনাফিক) অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।" (২ : ১০)*

*"স্মরণ কর যখন ফেরেশতাগণকে বলিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে বলিয়াছিল, 'আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?'*

*সে বলিয়াছিল, 'আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন, আপনি আমার ওপর এই ব্যক্তিকে মর্যদা দান করিলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে অবশ্যয়ই কর্তৃত্বাধীন করিয়া ফেলিব।'*

*আল্লাহ বলিলেন, 'যাও, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহবানে উহাদের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদেরকে আক্রমণ কর এবং উহাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হইয়া যাও ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও।' শয়তার উহাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র। 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার ক্ষমতা নাই।' কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।*

এবং আল্লাহ সুরা ইউসুফের শেষ রুকুতে বলেন :

*"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে না, তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন। তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে; কিন্তু তাহারা মুশরিক। তবে কি তাহারা*


www.nagorikpathagar.org

*আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ?*

*বল, 'ইহাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে- আমি ও আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহর শরিক করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'*

*তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম– যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম।*

*তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল তহারা কি তাহা দেখে নাই? যাহারা মুত্তাকি তাহাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না?*

*অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল রাসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। উহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা (কুরআন) এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার প্রত্যয়ন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।(১২ : ১০৫-১১১)।*


www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

একটি সত্যকে কি অনুমান, অর্ধ-সত্য অথবা অসত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? যদি সে কাজটিই করা হয়, যারা এই কর্মটি করছেন তাদেরকে এবং যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হচ্ছে সেটিকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে? 'সত্য বলা ভালো'– কিন্তু এই যে সত্য বলা ভালো, সেটি কি বিজ্ঞানের ধাঁচে ফেলে প্রমাণ করা যাবে?

সাধারণ অর্থে গ্রন্থ হচ্ছে, কতগুলো পরস্পর সম্পর্কিত লিখিত পাতার সমষ্ঠি যা সহজে পাঠযোগ্য ও বহনযোগ্য। একাডেমিক অর্থে গ্রন্থ হলো, গ্রন্থে লিখিত বিষয়বস্তু যা সেটি ধারণ করছে। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো গ্রন্থ পাঠ করেন বা গ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করেন কিন্তু পাঠক অথবা শ্রোতা যা উচ্চারণ করছেন বা শ্রবণ করছেন তিনি বা তারা সে সব শব্দের অর্থ জানেন না, বুঝতে পারেন না বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না– তিনি কি আদৌ কিছু পাঠ করছেন? *"যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহণকারী গর্দভ। ...।" (কুরআনুল করিম ৬২: ৫)*

যুগ যুগ ধরে গ্রন্থ বহণ করছেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থে লিখিত বিষয়বস্তু সম্মন্ধে অনবহিত-এ কর্মটি যেই করুক 'কাগজের বোঝা' বহণকারী গর্দভ ব্যতীত তিনি আর কী হতে পারেন?

বিশ্বব্যপী বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে 'ইসলাম' যখন আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দু তখন উপরোক্ত প্রশ্নগুলো গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে। 'কুরআনের আলোকে কুরআন, ইতিহাস ও হাদিস' গ্রন্থে লেখক এই প্রশ্নের যেমন প্রাথমিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন একই সঙ্গে তিনি এ সংক্রান্ত একটি একাডেমিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর চেষ্টা করা করেছেন।